বাতাসের কথা
প্রতুল চন্দ্র রক্ষিত

বাতাসের কথা

প্রতুল চন্দ্র রক্ষিত

শরৎ বুক হাউস, কলিকাতা

…………আজ সে কত কাল আগের কথা। আকাশ নক্ষত্র, গাছপালা, আলোবাতাস আরও কত কিছু নিয়ে তোমার প্রশ্নের অবধি ছিল না। তখন নানা কাজে ছিলাম ব্যস্ত, আমার সময় ছিল স্বল্প, জ্ঞান ছিল সামান্য—সে সব প্রশ্নের আর উত্তর দেওয়া হয় নি। তারপর একদিন হঠাৎ তুমি চলে গেলে। …………আজ জীবনের গোধূলিতে অলস সন্ধ্যায় সে সব মনে পড়ছে। তাই তোমাকে স্মরণ করে কিছু কিছু লিখে রাখলুম, জানি না ওপার থেকে তুমি জানতে পারবে কি না।

বাতাসের কথা

বাতাসের কথা

পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে একটা গ্যাসের আচ্ছাদন। সেই গ্যাসের মধ্যেই সর্বদা আমরা রয়েছি। গ্যাসের এই মোড়কটাকে আমরা বলি বাতাস, সাধুভাষায় বায়ুমণ্ডল।

পার্থিব জগতে যা কিছু আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিবিড় সম্পর্ক আমাদের বাতাসের সঙ্গে। জল আর বাতাস এই দুটোর ওপরে আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। জল বাদ দিয়েও হয়ত স্বল্প কয়েকদিন বেঁচে থাকা যায়। কিন্তু বাতাসের অভাবে কয়েক মিনিটের বেশী বাঁচা সম্ভব নয়। প্রতি মুহূর্ত্তে দিনে রাত্রে ঘুমে জাগরণে বাতাসের সঙ্গে প্রাণের দেওয়া-নেওয়ার হিসেব-নিকেশ চলছে। এজন্যেই বাতাস প্রাণ-স্বরূপ। শুধু মানুষ কেন, জীবজন্তু কীটপতঙ্গ আর যা কিছু পৃথিবীর বুকে আছে, সবই ডুবে আছে এই বাতাসের মহাসমুদ্রে। পৌরাণিক কাহিনীতে বায়ুকে অধিদেবতার মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই দেবতার প্রসাদেই প্রাণের অস্তিত্ব, অগ্নির আবির্ভাব।

জন্ম-কাহিনী

পৃথিবীর চারদিকে বাতাসের এই আবরণটা কি করে এল, এ প্রশ্ন বহুযুগের। এমনি গ্যাসের মোড়ক ত' চাঁদে নেই, নেই বুধ গ্রহে। তাই তাদের ভেতর প্রাণের অস্তিত্বও নেই। আর যে সব গ্রহ আছে তাদের আবরণ ঠিক আমাদের গ্যাসের মত ত' নয়। বাতাসের উৎপত্তি নিয়ে অনেকদিন থেকেই নানারকমের জল্পনা-কল্পনা, নানা গবেষণা হয়েছে। এখন মোটামুটি বোঝা গেছে বাতাসের উদ্ভব পৃথিবীর জন্মের সঙ্গেই জড়িত। তাই পৃথিবীর জন্ম-কাহিনীটাও একটু জানা প্রয়োজন।

পৃথিবী সৌর পরিবারের একটি গ্রহ। সূর্য্য একটি নক্ষত্র। নক্ষত্র মানেই জ্বলন্ত গ্যাসের বিরাট অগ্নিপিন্ড। সারাক্ষণ দাউ দাউ করে জ্বলছে আর তাপ এবং আলো বিকিরণ করছে। এই ব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ আমাদের ছায়াপথে রয়েছে এমনি কয়েক হাজার কোটি তারা।* সূর্য্য তাদেরই মধ্যে একটি মাঝারি-গোছের নক্ষত্র। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চারদিকে অনবরত ঘুরছে, সূর্য্যও তেমনি ছায়াপথের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে অবিরত ভীষণ বেগে ছুটছে। এক সময় মনে করা হ'ত এমনি ছোটার সময় অন্য কোন প্রকাণ্ড একটা নক্ষত্র সূর্য্যের যথেষ্ট সান্নিধ্যে এসে গিয়েছিল। তার প্রবল আকর্ষণে সূর্য্যদেহের খানিকটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে আসার ফলে এই গ্রহগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল, পৃথিবী তাদের অন্যতম। কিন্তু এখন জানা গেছে এ ধারণাটা নিতান্তই ভুল। এ রকমের ভুল হওয়াটা খুব আশ্চর্য্য নয়; একসময় ত' মানুষ বিশ্বাস করেছিল পৃথিবীটা স্থির আর তাকে কেন্দ্র করেই সূর্য্য আর সব নক্ষত্রেরা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। সেটাও ত মস্ত ভ্রম হয়েছিল।

---

* আমাদের ছায়াপথে নক্ষত্র সংখ্যা প্রায় $১০^{১১}$

ছায়াপথে কিন্তু সংখ্যাতীত নক্ষত্র ছাড়াও রয়েছে বিরাট ধুলো ও গ্যাসের উত্তাপহীন অনেক স্তূপ। এ সব ধুলো-গ্যাসের চাঙড় গুলো এত প্রকাণ্ড যে আমাদের এই সমস্ত সৌর-জগতটা অর্থাৎ সূর্য্য এবং তার বিস্তৃত গ্রহগুলো সেই বিরাট স্তূপগুলির তুলনায় নগণ্য। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা অঙ্কের সাহায্যে নানা তথ্য বের করেছেন। পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে আরও অনেক নূতন সূত্র ধরা পড়েছে। তাই নিশ্চিতরূপে এখন বলা সম্ভব হয়েছে, সুদূর অতীতে কোন এক সময়ে
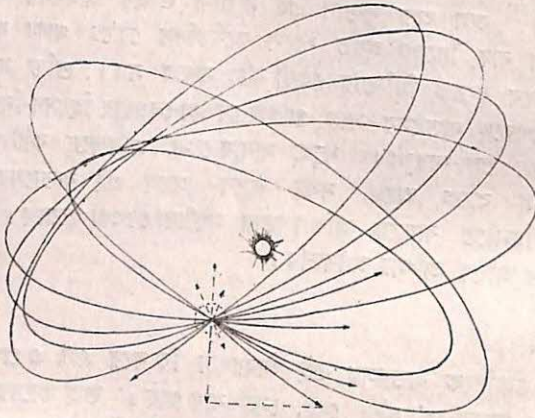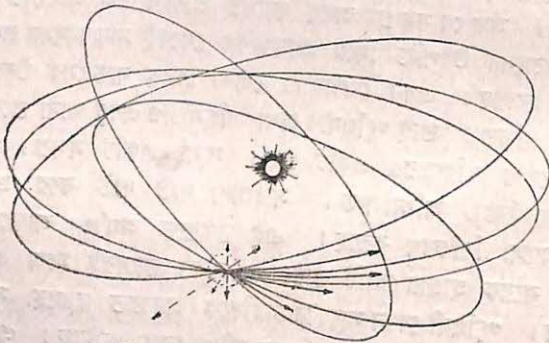
চিত্র ১। ধুলিকণার বিশৃঙ্খল গতিপথ
চিত্র ২। ধুলো-গ্যাসের অপেক্ষাকৃত সুসংযত গতিপথ

সূর্য্য ছুটতে ছুটতে চলার পথে কোন একটা ধুলো-গ্যাসের নীহারিকা থেকে একটুখানি অংশ টেনে নিয়ে এসেছিল। সেই ধুলো আর গ্যাসের চাপড়াটা সূর্য্যের আওতায় এসে ওর চারদিকে ঘুরতে আরম্ভ করল, কারণ সূর্য্য নিজেই নিজের অক্ষদন্ডের ওপর ঘুরছে।

ধুলো-গ্যাসের মেঘটি যখন প্রথম সূর্য্যের চারদিকে ঘুরতে শুরু করেছিল তখন নিশ্চয়ই ধুলোর কণাগুলো আর গ্যাসের অণুগুলো যেমন খুশী খামখেয়ালীভাবে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করেছিল। এর একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে ১ নং ছবি থেকে।

এই সব কণাগুলোর ছুটোছুটির সময় পরস্পরের মধ্যে অনিবার্য্য সংঘর্ষও অবশ্যই ঘটেছিল। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এমনি ঘোরার ফলে মেঘের বিভিন্ন অংশের অবিন্যস্ত গতিপথগুলো ধীরে ধীরে সুসংযত হ'য়ে এল। গ্যাস আর সমস্ত কণাগুলো মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে থেকে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করতে লাগ্‌ল (চিত্র ২)।

ইতিমধ্যে আর আর একটা পরিবর্তনও আরম্ভ হয়েছিল। ধুলোর কণাগুলো কঠিন আর অপেক্ষাকৃত ভারী বলে সেগুলো মেঘের মাঝখানে গিয়ে পড়ল আর তার বাইরে রইল গ্যাস। তখন সেই গ্যাস-ধুলো স্বাভাবিক নিয়মেই সূর্য্যের চারদিকে একটা চ্যাপ্‌টা ধরনের বলয়ের সৃষ্টি করল। মনে রাখ্‌তে হবে এই প্লেটের মতো বলয়টা সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছিল। সেই বলয়ের মাঝখানটা অপেক্ষাকৃত মোটা আর সূর্য্যের দিকের কাছাকাছি অংশটা বা তার বিপরীত দিকের অংশটা হয়ে গেল সরু। অবিরত ঘোরবার ফলে সমস্ত মেঘটাই আরও চ্যাপ্‌টা হ'তে লাগ্‌ল, কুমোরের চাকে মাটির তাল ঘোরালে যেমন হয় তেমনি (চিত্র ৩, ৪)।
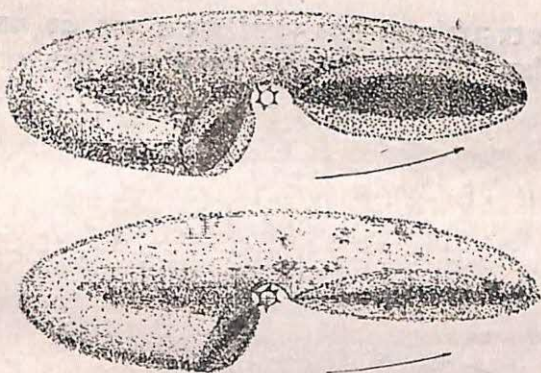
চিত্র ৩

বিচ্ছিন্ন বস্তুস্তূপকে একত্রে খুব জোরে ঘুরতে দিলে এ রকমের আকার হওয়াটাই প্রকৃতির নিয়ম। এর ফল হলো ধূলিকণাগুলো পরস্পরের খুব সান্নিধ্যে এসে পড়ল এবং তাদের ভেতর যথেষ্ট আকর্ষণের সৃষ্টি হ'ল। কালক্রমে সেই কঠিন কণাগুলো মেঘের নানা যায়গায় একত্র পুঞ্জিত হতে শুরু করল। এর অর্থ ধুলোর কণা থেকে খানিকটা বড় সব পিন্ড বা শিলাখন্ডের সৃষ্টি হতে লাগল। বলবিদ্যার একটা প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, চলমান বস্তুর মোট ভরবেগের কোন পরিবর্তন হয় না। বড় বড় পাথুরে বস্তু যখন তৈরী হ'ল, ওদের ভরের বৃদ্ধির জন্যে গতিবেগ খানিকটা মন্থর হ'য়ে এল। গ্যাসও ঘনতর হ'য়ে পড়ল। ধুলোর পুঞ্জীভবন কিন্তু এখানেই সীমিত ছিল না। শিলাখন্ডগুলোও আবার পরস্পরের কাছাকাছি এসে আরও বড় বড় পাথরের চাঁই তৈরী করল। এর মাঝখানে অবশ্যই রয়েছে অনেক ভাঙ্গা-চোরার

সংহতি-বিস্তৃতির ইতিহাস। অঙ্কের সেসব কূটজালের মধ্যে না গিয়েও সাধারণ ভাবে
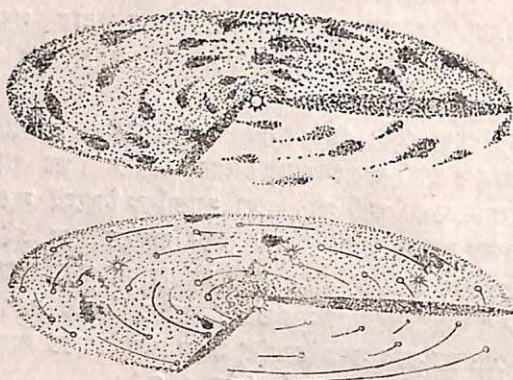
চিত্র ৪। ধুলো-গ্যাসের মেঘটা বলয়ের আকার পেয়েছে

বলা যেতে পারে যে সূর্য্যের চারদিকের বলয়ের গ্যাসের মধ্যে এক ঝাড় শিলাখণ্ডও প্রদক্ষিণ করছিল (চিত্র ৫)। এগুলোকে আমরা নাম দিতে পারি 'গ্রহকণা'।
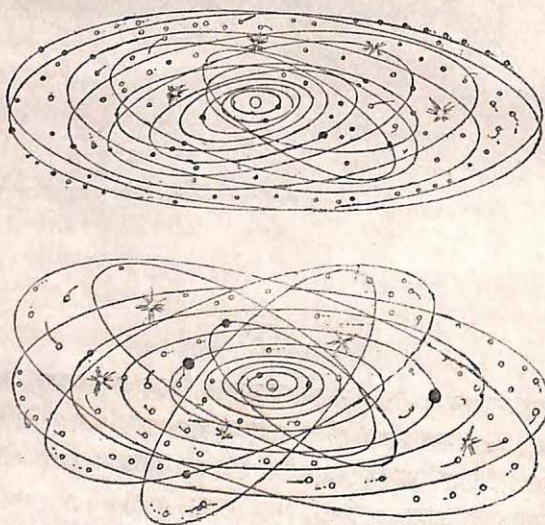
চিত্র ৫। বলয়ের ভেতর শিলাখণ্ড তৈরী হচ্ছে

বিজ্ঞানীরা মনে করেন প্রথমে যে সব এরকম কঠিন পিণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলোর ব্যাস হয়ত দশ থেকে একশ মাইলের মতো হবে। এগুলো যত বড় হ'তে শুরু করল, ধুলো-গ্যাসের চাকতিটাও আরও সমতল বা চ্যাপ্টা হ'য়ে গেল। এমনি আকারের শিলাখণ্ড ত' আজও মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝখানের গ্রহাণুপুঞ্জে রয়েছে!

এর সঙ্গে আর একটা বিষয় ভাবতে হবে। এই কণাগুলো বা পরে ছোট ছোট শিলাখন্ডগুলো যখন পুঞ্জিত হচ্ছিল তখন তাদের গতিশক্তির খানিকটা বিলোপ হয়েছিল। এবং সেই শক্তির পরিবর্তে যথেষ্ট তাপশক্তির উদ্ভব হয়েছিল। এই তাপের কিছুটা বিচ্ছুরিত হয়ে গিয়েছে. কিন্তু বাকী তাপটা পেয়ে নূতন শিলাখণ্ডগুলি আবার তাদের নিজেদের অক্ষদণ্ডের চারদিকে আবর্তিত হ'তে শুরু করল। বড় বড় শিলাগুলি যখন নিজেদের অক্ষদণ্ডে পাক খেতে লাগ্ল তাদের আশে পাশে যে অজস্র ধূলার কণা আর গ্যাস ছিল সেগুলো আবার এই শিলাগুলোকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল আর শেষ পর্যন্ত প্রবল আকর্ষণে সেই শিলার ওপরেই এসে পড়ল। এমনি করে শিলাগুলো যে পুঞ্জীভবনের ফলেই বড় হ'ল শুধু তাই নয়, ওদের ওপরে ধূলোর উপলেপ পড়ে' পড়ে' সেগুলোকে আয়তনে প্রকান্ড করে তুলল। অর্থাৎ বহু কোটি বছর আগে যে ধূলো-গ্যাসের চাঙড়টা সূর্যের পদানত হ'য়ে এসেছিল, সেটা কালক্রমে কয়েকটি কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত হ'য়ে গেল। এভাবেই ভবিষ্যতের গ্রহগুলির ভ্রূণের আবির্ভাব ঘটেছিল (চিত্র ৬)। মেঘের মাঝখানটা ছিল মোটা তাই সেখানে যে ভ্রূণের
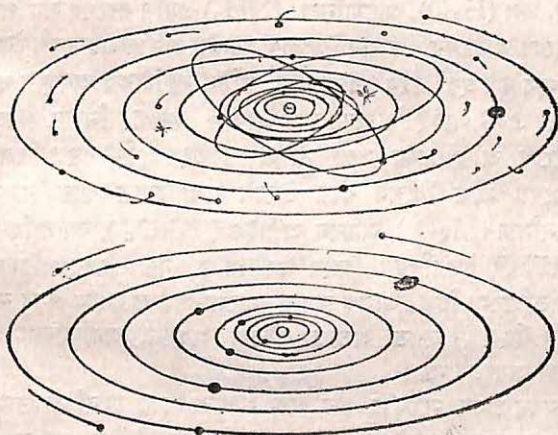
চিত্র ৬। শিলাখণ্ডগুলি চারদিকের ধূলিকণা নিয়ে একত্র পুঞ্জীভূত হয়ে গ্রহের রূপ গ্রহণ করল

সৃষ্টি হ'ল সেটা অন্যদের চেয়ে বড়, সেটা আজকের গ্রহরাজ বৃহস্পতি। এর দুদিকের গ্রহগুলি আয়তনে ক্রমশঃ ছোট।

বৈজ্ঞানিক অটো স্মিট (Otto Schmidt) অঙ্ক কষে' বুঝিয়ে দিয়েছেন এ পরিবর্তনগুলো প্রাকৃতিক নিয়মেই স্বাভাবিক উপায়ে ঘটেছে এবং সেটা অবশ্যম্ভাবী। এটা কোন অবাস্তব কল্পনার কথা নয়।

এই সৃষ্টির সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন জড়িত রয়েছে, এখন সেটা আলোচনা করা যেতে পারে। ধূলো-গ্যাসের যে মেঘ থেকে গ্রহাণুপুঞ্জগুলো প্রথমে তৈরী হ'ল, সেগুলি কি ছিল? কোন্ গ্যাস ছিল সে সব স্তূপে, যে ধূলোকণা ছিল সেগুলো কি সাধারণ

যে মাটির ধুলো আমরা দেখি তাই? মহাবিশ্বের সৃষ্টিতে দেখা যায় হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামই প্রধান উপাদান। সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুসম্ভারের শতকরা নব্বই ভাগ হাইড্রোজেন, প্রায় নয় ভাগ হিলিয়াম। এর পর রয়েছে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন আর কার্বন—এই তিনটিতে মিলে শতকরা 0·3 ভাগ মাত্র। আর বাকী সব মৌল, যেমন সিলিকন, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদির পরিমাণ খুবই সামান্য। দূর-দূরান্তরের নক্ষত্র, সৌরদেহ, নীহারিকা-গ্যাস, মহাশূন্যের নানা জ্যোতিষ্কের পরীক্ষা থেকে জানা গেছে ঐ রকমের অনুপাতেই হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ইত্যাদি সর্বত্র রয়েছে। সেই আদিযুগে সূর্য্য যখন গ্যাসের আর ধুলোর চাঙড়টাকে টেনে নিয়ে এসেছিল তার মধ্যেও হাইড্রোজেন, হিলিয়াম সেই অনুপাতেই ছিল একথা মেনে নিতে বাধা নেই।

এসব মৌলের পরমাণুগুলি আবার সুযোগ পেলে বা সুবিধামতো অবস্থায় পড়লে পরস্পরের সঙ্গে মিলে গিয়ে নানারকমের পদার্থ সৃষ্টি করেছিল সন্দেহ নাই। হাইড্রোজেনের ছিল প্রাচুর্য্য, তাই হাইড্রোজেন অন্য যেগুলো অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে ছিল তাদের সঙ্গে সংহত হয়েছিল। এভাবে নিশ্চয় হাইড্রোজেন গ্যাস (H_2) মিথেন (CH_4), জল (H_2O), অ্যামোনিয়া (NH_3) এমনি ধরণের সব পদার্থের সৃষ্টি হয়েছিল। এগুলো আমাদের বর্তমান উষ্ণতায় গ্যাসীয় অর্থাৎ এরা বেশ উদ্বায়ী। কিন্তু তাপমাত্রা যদি খুব কম হয় তবে এগুলোও কঠিন স্ফটিকের অবস্থায় থাকতে পারে। তাপমাত্রার কথাটা একটু পরেই বিবেচনা করা হবে। অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, সীসা আর অন্যান্য ধাতুগুলো অক্সিজেনের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে সৃষ্টি করল শিলাজাতীয় নানা পদার্থের। এদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে বালু (সিলিকা, SiO_2), ম্যাগনেসিয়া (MgO), আয়রন অক্সাইড (Fe_2O_3), অ্যালুমিনা (Al_2O_3), লেড অক্সাইড (PbO) ইত্যাদির। তবে অন্যদের তুলনায় এদের পরিমাণ কম, কারণ শুরু থেকেই ধাতুগুলো ছিল অনেক কম। ধুলো-গ্যাসের মেঘে এসব বস্তুরই সূক্ষ্ম-কণা ধুলো হ'য়ে ছিল। হয়ত অত্যন্ত শীতল অবস্থায় অ্যামোনিয়া, জল ইত্যাদিও কঠিনাকারে থাকা অসম্ভব নয়।

ঐ মেঘটা যখন প্রথম সূর্য্যের চারদিকে ঘুরতে শুরু করেছিল তখন সূর্য্যকিরণ মেঘের ভেতরে প্রবেশ করে সেটাকে সর্বত্র প্রায় সমান ভাবেই উষ্ণ করে রেখেছিল, যদিও সেই উষ্ণতা খুব বেশী নয়। কিন্তু যখন সেই মেঘের মধ্যে বড় বড় শিলার সমাবেশ হ'তে শুরু করল আর ধুলো-গ্যাসের মেঘটা বলয়াকার হ'য়ে গেল, তখন সূর্য্যের তাপ এবং আলোরশ্মির পথে বাধার সৃষ্টি হ'ল। বলয়ের যে অংশটা সূর্য্যের কাছাকাছি সেটা গরম হ'য়ে উঠল। সূর্য্য থেকে দূরত্বটা যত বাড়তে লাগল, তাপমাত্রাও তত কমতে লাগল। একটা গাণিতিক অনুমানে দেখা গেছে, সূর্য্যের নিকটতম গ্যাস-ধুলোর অংশের তাপমাত্রা প্রায় 500°C ছিল। দূরত্বের সঙ্গে এই উষ্ণতা কমে কমে 0°C এবং আরও দূরে অত্যন্ত ঠান্ডা (প্রায় –270°C) পর্য্যন্ত নীচে নেমে গেল (চিত্র ৭)। এর কারণ সূর্য্যের তাপরশ্মি কঠিন শিলার পাঁজর ভেদ করে আর দূরে পৌঁছুতে পারেনি। শতকোটি মাইল দূরে, এখন যেখানে বৃহস্পতি (Jupiter) বা শনি (Saturn) রয়েছে, সেখানে উষ্ণতা নেমে গেল প্রায় পরম শূন্যের কাছাকাছি (0°K)।

এই উষ্ণতায় সমস্ত পদার্থই থাকে কঠিন অবস্থায়। তাপমাত্রার এই বৈষম্যের ফল কিন্তু বিচিত্র।
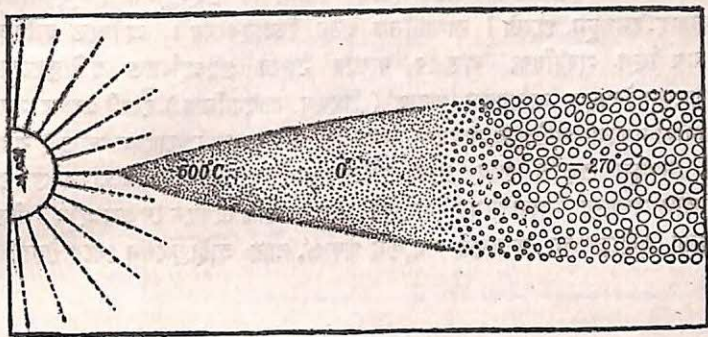
চিত্র ৭। ধূলো-গ্যাসের মেঘে তাপমাত্রার বৈষম্য

সূর্য্যের নিকট অংশের উষ্ণতা ছিল বেশী, তাই সেখান থেকে সহজ-উদ্বায়ী পদার্থ-গুলি যেমন অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, মিথেন, নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়াম, নিয়ন এসব উবে গেল। হয়ত খানিকটা পাতিত হ'য়ে পেছনের দিকে কম উষ্ণতার রাজ্যেও চলে গিয়েছিল। দূরের অংশে উষ্ণতা ছিল কম, সূর্য্যের রশ্মি পেঁাছায় নি, সেখানকার উদ্বায়ী গ্যাসগুলি পালিয়ে যায়নি, বরং অতি শীতল তাপমাত্রার জন্যে মিথেন, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি কঠিনাকারেই ছিল। এমন কি হাইড্রোজেনও হয়ত অনেকদূরে কতকটা কঠিনাকারে ছিল। তারপর কালক্রমে যখন
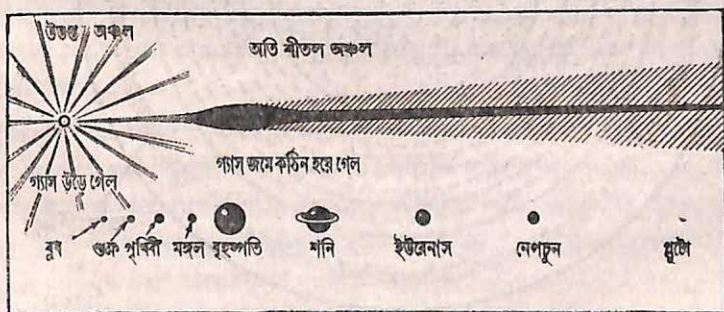
চিত্র ৮। বিভিন্ন তাপমাত্রায় গ্রহদের উৎপত্তি

শিলাখন্ডগুলি পুঞ্জিত হ'য়ে গ্রহের ভ্রূণে পরিণত হ'তে শুরু করল, তখন সূর্য্যের কাছের গ্রহগুলিতে কোন গ্যাসের আবরণ রইল না (চিত্র ৮)। কিন্তু দূরান্তরের

গ্রহগুলিতে এসব উদ্বায়ী বস্তুগুলি থেকে গেল এবং তাদের বেশীর ভাগই কঠিনাকারে র'য়ে গেল. এই জন্যেই বুধ থেকে মঙ্গল [বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল] এই চারটি গ্রহের রাসায়নিক গঠন একরকমের আর দূরের বিশালাকার গ্রহগুলির [বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস্, নেপচুন, প্লুটো] রাসায়নিক গঠন ভিন্নরকমের। আদিতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ ছিল সর্বাধিক, অতএব দূরের ঠান্ডা গ্রহগুলিতে হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোজেন-উদ্ভূত নানারকম পদার্থ (মিথেন, অ্যামোনিয়া) বেশী থাকার সম্ভাবনা। বিজ্ঞানীরা বর্ণালী পরীক্ষার সাহায্যে এখন নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছেন সত্যিই বৃহস্পতি, শনি, নেপচুন প্রভৃতি গ্রহে প্রচুর হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, মিথেনের স্তর রয়েছে। বৃহস্পতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণার একটা ছবি এখানে দেওয়া হ'ল (চিত্র ৯)। তা ছাড়া হাইড্রোজেন জগতের লঘুতম পদার্থ, আর হাইড্রোজেন থেকে তৈরী অন্যান্য
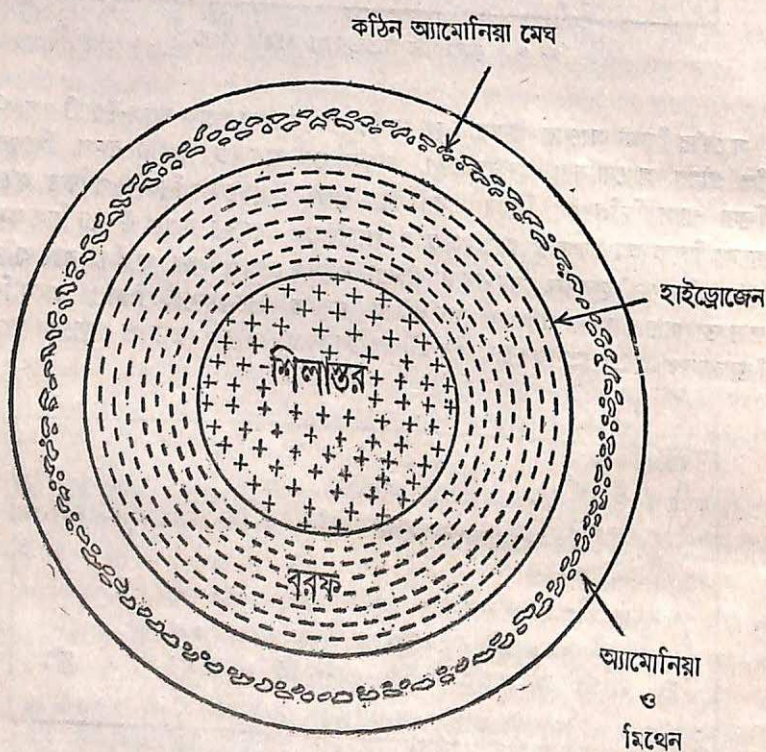
চিত্র ৯। বৃহস্পতির গঠন সম্বন্ধে ধারণা

পদার্থগুলিও (জল, অ্যামোনিয়া, মিথেন) হাল্কা। সুতরাং গ্রহগুলি সম্পর্কে উপরে যে ধারণা করা হয়েছে, সেটা সত্য হ'লে দূরের গ্রহগুলির ঘনত্বও কম হবে। পরীক্ষাতেও

সেই কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে, যদিও আয়তনে বা ওজনে দূরের গ্রহগুলি অনেক বিশালতর।

গ্রহ	বুধ	শুক্র	পৃথিবী	মঙ্গল	বৃহস্পতি	শনি	ইউরেনাস	নেপচুন	প্লুটো
* ঘনত্ব	5.5	5.1	5.52	3.9	1.34	0.70	1.4	2.2	—
** দূরত্ব	0.39	0.72	1.00	1.52	5.20	9.54	19.2	30.0	39.5
*** ব্যাসার্ধ	0.38	0.96	1.00	0.53	10.95	9.14	3.9	3.5	—
**** ওজন	0.054	0.816	1.00	0.107	318.3	95.3	14.6	17.26	—

* ঘনত্বের একক, গ্রাম প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে।

** পৃথিবীর (সূর্য্য থেকে) দূরত্বের এককে।

এই দূরত্বের একক = 149·5 million km = 92·96 millon miles

*** পৃথিবীর ব্যাসার্ধের এককে।

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ = 6356·9 km = 3950 miles

**** পৃথিবীর ওজনের এককে।

পৃথিবীর ওজন = 5977×10^{24} Kg = 5883×10^{18} tons.

এ সকল তথ্য থেকে দুই পর্য্যায়ের গ্রহের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে।

এখন আমাদের নিজেদের গ্রহ পৃথিবীর কথায় আসা যাক। পৃথিবী প্রথম পর্য্যায়ের অর্থাৎ সূর্য্যের নিকটতম গ্রহ চারিটির একটি। সুতরাং এর প্রথম উৎপত্তির সময়ে মার্তণ্ডের প্রতাপে এর চারিদিকের গ্যাস সব উদ্বায়িত হ'য়ে গিয়েছিল। পৃথিবী যখন জন্ম নিয়েছিল তখন সে ছিল নিরাবরণ; গ্যাসের ওড়নাটা ছিল না। জন্মকালে এর উষ্ণতাও বেশী ছিল না, মোটামুটি ঠাণ্ডাই ছিল। তাছাড়া এর রাসায়নিক গঠনের একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।*

পৃথিবীতে অক্সিজেনের পরিমাণ তার নাইট্রোজেনের চেয়ে অন্ততঃ দশহাজার গুণ বেশী। কিন্তু সূর্য্যে বা ব্রহ্মাণ্ডের অন্য সব নক্ষত্র বা নীহারিকায় সর্বত্রই অক্সিজেনের পরিমাণ নাইট্রোজেন অপেক্ষা তিনচার গুণের বেশী নয়। এর কারণ হ'ল, অক্সিজেনের অন্যান্য মৌলের সঙ্গে সহজে সম্মিলিত হ'য়ে নানারকমের পদার্থ উৎপাদনের ক্ষমতা।

---

* কি করে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড এবং তার মধ্যে সূর্য্যের মতো কোটি কোটি নক্ষত্রের সৃষ্টি হ'ল, এ বিষয়ে বিজ্ঞানী গ্যামো (Gamow), হয়েল (Hoyle), কুইপার (Kuiper) এবং আফ্‌বেন (Alfven) বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করেছেন। এঁদের প্রকল্পগুলির মধ্যে অবশ্যই গুরুতর মতভেদ রয়েছে। কিন্তু সূর্য্যের চারদিকের গ্রহগুলো যে একটা ঘূর্ণায়মান গ্যাসের বলয় থেকে পুঞ্জীভবনের ফলে উদ্ভূত, সেটা মোটামুটি প্রত্যেক মতবাদেই স্বীকৃত হয়েছে; কিন্তু কিভাবে এই গ্যাস-ধুলো সূর্য্যের আয়ত্তে এল তা নিয়ে সবাই একমত ন'ন।

নাইট্রোজোনের সক্রিয়তা অপেক্ষাকৃত কম, তাই খুব বেশী পদার্থ সে তৈরী করে না। ফলে অক্সিজেন নানা পাথুরে ধরণের অক্সাইডে (SiO_2, Al_2O_3, MgO ইত্যাদি) পরিণত হয়ে কঠিন অবস্থায় থেকে গেছে। নাইট্রোজেন এ রকম অবস্থায় খুবই কম যেতে পেরেছে, ওর অধিকাংশই ছিল গ্যাস অবস্থায়। সৌরতাপে সেই গ্যাস উবে গেছে।

নিয়ন, ক্রপটন, প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরিমাণ পৃথিবীতে এত কম, যে নেই বললেই চলে। অন্যান্য নক্ষত্রে বা অন্যান্য গ্যাস-নীহারিকাতে যে পরিমাণ নিয়ন আছে পৃথিবীতে তার দশলক্ষ-ভাগের একভাগ মাত্র আছে। ক্রপটন, জিনন প্রভৃতির পরিমাণ আরও কম। এর কারণ, এরা উদ্বায়ী গ্যাস এবং অন্য কোন যৌগ উৎপাদনে অক্ষম ; তাই পৃথিবী এদের ধরে রাখতে পারে নি।

আগেই বলেছি, দূরের বিশাল গ্রহগুলির তুলনায় পৃথিবীতে হাইড্রোজেনের পরিমাণ অনেক কম, যেটুকু আছে সেটা জল (H_2O) আর কিছু জৈব-যৌগ আকারেই আছে। হিলিয়ামের পরিমাণও পৃথিবীতে সামান্য। কেউ কেউ একটা মতবাদ পোষণ করেন, প্রথমাবস্থায় পৃথিবী (এবং অন্যান্য গ্রহেরাও) ছিল উত্তপ্ত গ্যাস-পিন্ড, ক্রমে ঠাণ্ডা হ'য়ে কঠিনাকার ধারণ করেছে। পৃথিবীর ওজন কম, মাধ্যাকর্ষণের শক্তি কম, তাই হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এসব হাল্কা গ্যাস ধরে রাখতে পারেনি। বৃহস্পতি, শনি এসব গ্রহ বিশালকায়, প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণের ফলে ওরা হাইড্রোজেন, হিলিয়াম আর অন্যান্য গ্যাস রাখতে পেরেছে। কিন্তু এ ধারণাটা ঠিক নয়। এর বিরুদ্ধে কয়েকটা কথা বলা যায়। প্রথমতঃ, আদিম গ্যাস থেকে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন উবে গেলে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা সম্ভব, হিসেব করলে দেখা যায় প্রথমাবস্থায় তা হ'লে পৃথিবী ছিল বর্তমানের 120 গুণ, অর্থাৎ বর্তমান বৃহস্পতির প্রায় তিনগুণ। কাজেই বৃহস্পতি যদি হাইড্রোজেন আর অনান্য হাল্কা গ্যাস ধরে রাখতে পারে, পৃথিবীর না পারার কারণ ছিল না। তা ছাড়া সেই পরিমাণ হাইড্রোজেনকে চলে যেতে সময় প্রয়োজন অন্ততঃ ছয় হাজার কোটি বছর। কিন্তু নানারকম হিসেব থেকে জানা গেছে পৃথিবী গ্রহের বয়েস ছয় শত কোটি বছরের বেশী নয়।

দ্বিতীয়তঃ, যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কম থাকার জন্যেই হাল্কা গ্যাস উধাও হ'য়ে থাকে, তবে অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন যারা প্রায় সমান ভারী বা হাল্কা, সেগুলোও সমান ভাবেই উবে যেত প্রথম থেকেই। তাহ'লে, বর্তমান পৃথিবীতে নাইট্রোজেনের এবং অক্সিজেনের অনুপাত অন্যান্য নক্ষত্রের মতোই হ'ত। কিন্তু তা নয়।

তৃতীয়তঃ, কিছুদিন আগে (1944) কুইপার নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করেছেন শনির উপগ্রহ টাইটানের (Titan) একটা আবহমণ্ডল আছে এবং তাতে আছে প্রচুর অ্যামোনিয়া আর মিথেন। দুইই যথেষ্ট হাল্কা গ্যাস। টাইটানের মাধ্যাকর্ষণ খুব কম, কারণ তার ওজন পৃথিবীর $\frac{1}{40}$ অংশ। অতএব, এসব হাল্কা গ্যাস সেখানে থাকার কথা নয়। সুতরাং উত্তপ্ত বা জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড ঘনীভূত হ'য়ে পৃথিবীর সৃষ্টি এবং হাল্কা বস্তুগুলির উদ্বায়িত হ'য়ে যাওয়ার মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

পুরানো আলোচনায় ফিরে আসি। পৃথিবী যখন আত্মপ্রকাশ করল গ্রহের আকারে, তার গ্যাসের আবরণ তখন নেই, সব গ্যাস উদ্বায়িত হ'য়ে গেছে। কিন্তু সেসব গ্যাসের অনেকেরই খানিকটা, সেই উষ্ণতায় যে সব পাথুরে কঠিন পদার্থ বা অক্সাইড ছিল, তাদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে গিয়েছিল এবং কঠিন দেহের অভ্যন্তরে স্থান নিয়েছিল। এমনি করে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন সঞ্জাত পদার্থগুলি অন্যান্য বস্তুর কঠিন অবস্থায় চলে যেতে পেরেছিল। এ ভাবেই শিলার আবির্ভাব হয়েছিল। যাঁরা রসায়ন-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা এসব পরিবর্তন সঙ্কেত দিয়েই প্রকাশ করেন। যেমন,

$$Al_2O_3 + xH_2O \rightarrow Al_2O_3, xH_2O \quad \| \quad MgO + CO_2 \rightarrow MgCO_3$$

$$x\,SiO_2 + Al_2O_3 + yH_2O \rightarrow Al_2O_3\,(SiO_2)\,x, yH_2O$$
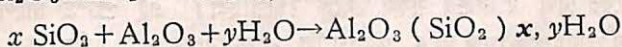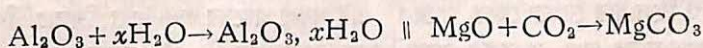
শুধু তাই নয়, ভ্রূণের পরিপুষ্টির সময় যখন দ্রুতবেগে বড় বড় শিলাখন্ডগুলি পুঞ্জিত হচ্ছিল তখন ওদের ভিতরে খানিকটা গ্যাস নিশ্চয়ই আটকে পড়েছিল। দেহায়তন বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহের অভ্যন্তরে চাপও খুব বেড়ে গিয়েছিল। একটা হিসেব থেকে মনে হয় ভেতরে এখন চাপ অন্ততঃ কয়েক লক্ষ অ্যাটমস্ফিয়ার হবে। এই প্রচণ্ড চাপে অবরুদ্ধ থেকে গ্যাস অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে মিলিত হয়ে গিয়েছিল এবং হয়ত তরল বা কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর দেহ যখন গড়ে উঠ্ছিল তখন অত্যন্ত ঠাণ্ডা সব উল্কাখণ্ডের প্রবল বর্ষণও তার ওপরে হয়েছিল। এই সব উল্কাপাতের মধ্যেও বরফ আর নানা গ্যাসীয় বস্তু কঠিন অবস্থায় এসে পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিল।

এ কথা ঠিক পৃথিবীটা কখনো উত্তপ্ত গ্যাস বা গরম কোন তরল বস্তু ঘনীভূত হয়ে তৈরী হয়নি। শিলাখণ্ডগুলো একত্র হয়েই এটা তৈরী এবং তখন তাপমাত্রাও বেশী ছিল না। কিন্তু যে সব শিলাগুলো এসে পুঞ্জীভূত হয়েছিল তার মধ্যে কিছু তেজস্ক্রিয় মৌল, যেমন, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতিও ছিল। তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি অস্থায়ী এবং নিজে থেকেই ভেঙে যায়। এদের পরমাণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস থেকে আল্ফা, বীটা প্রভৃতি রশ্মি বেরিয়ে আসে এবং নূতন নূতন মৌলে পরিণতি লাভ করে। যেমন, ইউরেনিয়াম থেকে রেডিয়াম, পলোনিয়াম প্রভৃতির সৃষ্টি হয়; এরাও তেজস্ক্রিয় সুতরাং স্বতঃভঙ্গুর। এমনি ভাঙতে ভাঙতে শেষ পর্যন্ত তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি সীসাতে পরিণত হয়। সীসা স্থায়ী মৌল, তার তেজস্ক্রিয়তা নেই। পৃথিবীর অভ্যন্তরের তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি ক্রমাগত স্বাভাবিক নিয়মে তেজ বিকিরণ করেছে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। বিকিরণের সময় যে আল্ফা রশ্মি নির্গত হয়েছে তাই থেকে হিলিয়াম গ্যাসের সৃষ্টি হয়েছে, তার সঙ্গে উৎপত্তি হয়েছে প্রচুর উত্তাপের। প্রত্যেক তেজস্ক্রিয় বিভাজনেই তাপ নির্গত হয়েছে। কিছুটা তেজস্ক্রিয় পটাসিয়ামও ছিল, সেগুলো ভেঙে হয়েছে ক্যালসিয়াম আর আর্গন। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে অবিরাম তেজস্ক্রিয়ার ফলে যে প্রচন্ড তাপ উদ্ভূত হয়েছে, সেটা গ্রহের অভ্যন্তরেই জমা হয়েছে, ফলে, ভেতরের তাপমাত্রা হাজার হাজার ডিগ্রি বেড়ে

গিয়ে সেখানকার কঠিন বস্তুকে গলিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে যে হিলিয়াম ও আর্গন দেখতে পাই তার উৎসও প্রধানতঃ ঐ তেজস্ক্রিয়া। শিলাখণ্ডের তাপবাহিতা কম, উৎসারিত তাপ বাইরে চলে যেতে পারেনি। অবরুদ্ধ তাপে পৃথিবীর অভ্যন্তরের কেন্দ্রের অঞ্চল গিয়েছে গলে, তার উপর রয়েছে প্রচণ্ড চাপ। শুধু যে শিলাগুলো গলে গিয়েছে তাই নয়, অনেক শিলাই উচ্চ তাপমাত্রায় বিযোজিত হয়ে গিয়েছে এবং সেখান থেকে উদ্বায়ী গ্যাস সব সৃষ্টি হয়েছে। এই গ্যাসগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে জলীয় বাষ্প (সোদক শিলাখণ্ড থেকে), কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন। এদের সঙ্গে কিছু হিলিয়াম, আর্গন এবং সম্ভবতঃ সামান্য অক্সিজেন প্রভৃতিও ছিল ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই সকল গ্যাসের জন্য এবং শিলার বিগলন হেতু অভ্যন্তরের চাপ অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছিল। এই প্রচণ্ড চাপের ফলে বাইরের কঠিন আবরণকে ভেদ করে গ্যাসগুলি স্বাভাবিকভাবেই মুক্তি পেতে চেষ্টা করেছে। ভিতরে তখন প্রচণ্ড চাপ ও তেজের উৎপাত। ঘাত-প্রতিঘাতে কঠিন আবরণের কোথাও কোথাও ফাটল ধরেছে। সেখান দিয়ে প্রচণ্ড বেগে জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ও অন্যান্য গ্যাস বেরিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে কোথাও গলিত শিলা। কখনও কখনও প্রচণ্ড চাপে উপরের কঠিন স্তর উঁচু হয়ে উঠে পাহাড় পর্বতের সৃষ্টি করেছে, কোথাও গ্যাস বেরিয়ে আসার পর, সঙ্কোচনের ফলে উপরের স্তর নীচে চলে গিয়ে বিরাট বিরাট গহ্বর ও গুহার সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর সেই শিশুকালে তেজস্ক্রিয়তা ছিল বেশী, তাপও উৎসারিত হয়েছিল অসম্ভব। সুতরাং অভ্যন্তরে অস্থিরতা চলেছিল অনেক যুগ ধরে, ভাঙা-গড়ার উলট-পালট দীর্ঘদিন ধরে চলার পরে একটা মোটামুটি সাম্যাবস্থায় এসে পৃথিবী পৌঁছুল। কিন্তু সেই আভ্যন্তরিক উৎপাত যে একেবারে শেষ হয়ে গেছে তা নয়। ভেতর থেকে এখনও গ্যাস ও জলীয় বাষ্পের উৎসারণ চলছে। আগ্নেয়-গিরির বিস্ফোরণের সঙ্গে আজও গলিত লাভা-শিলার সাথে প্রচুর জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই-অক্সাইড বেরিয়ে এসে অভ্যন্তরের অস্থিরতার প্রমাণ দিচ্ছে।

আগেই বলেছি, অভ্যন্তর থেকে উৎসারিত গ্যাসের অধিকাংশই ছিল জলীয় বাষ্প এবং তার পরিমাণও ছিল প্রচুর। আর তার পরেই হ'ল কার্বন ডাই-অক্সাইড। এই গ্যাসগুলো পৃথিবীকে আবৃত করে রইল। সুতরাং এখন যে বায়ুমণ্ডল পৃথিবী ঘিরে রয়েছে, তখনকার গ্যাসের মোড়কটা এরকম ছিল না মোটেই। জলীয় বাষ্প ঘন হয়ে বহু মাইল পুরু একটা মেঘের আবরণ পৃথিবীকে ঘিরে রইল; ঠিক এখন যেমন শুক্র গ্রহের অবস্থা। আজকের দিনেও শুক্র গ্রহের দেহটিকে আমরা দূরবীক্ষণ দিয়েও দেখতে পাই না, কারণ তার চারদিকে একটা অত্যন্ত ঘন বাষ্পের আবরণ রয়েছে। সূর্যের আলো এই আবরণ থেকে প্রতিফলিত হয় বলে, শুক্রকে এত উজ্জ্বল দেখায়। সেই আদিম যুগেও পৃথিবী যখন বাষ্প-মেঘে আবৃত ছিল' তখন সূর্যের আলোর প্রায় ৬০ শতাংশ প্রতিফলিত হ'ত, বাকী ৪০ শতাংশ মেঘ শোষণ করে নিত। সেই যুগে মঙ্গল গ্রহে দাঁড়িয়ে যদি পৃথিবীর দিকে তাকান যেতো, তবে পৃথিবীকে এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক বলে মনে হ'ত। চাঁদ যে এত উজ্জ্বল সেখান থেকে সূর্যের আলোর মাত্র শতকরা ৭ ভাগ প্রতিফলন হয়। সেদিনে পৃথিবীর বুকে

সূর্যের আলো এসে পৌঁছুত না, ফলে সেখানে কোন দিন-রাত্রি ছিল না, সদা সর্বদা অন্ধকার।

এই ঘনমেঘ থেকে যখনই বৃষ্টি-ধারা পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে তখনই সেই জল পৃথিবীর ভিতরের থেকে উৎসারিত আগুনের হল্কা আর ফুটন্ত বাষ্পের তাপ প্রবাহে আবার উদ্বায়িত হয়ে গিয়েছে, কোন জল্ জম্তে পায়নি। তারপর কয়েক লক্ষ বছর ধরে অভ্যন্তরের দুর্বার অস্থিরতা চলার পর যখন স্বস্তি এলো, তখন পৃথিবী-পৃষ্ঠ ধীরে ধীরে শীতল হতে শুরু করল। এইবারে মেঘ থেকে নাম্ল প্রচণ্ড বৃষ্টির ধারা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, শতশত বছর ধরে অবিরল অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত চল্ল পৃথিবীর ওপর। কঠিন ভূমিতল বেয়ে বেয়ে নীচু গহ্বরে গিয়ে এই জল জম্তে আরম্ভ করল, সৃষ্টি হ'ল নদী, হ্রদ, সমুদ্রের। পৃথিবীর বুকে যে আজ অগাধ জলরাশি তা এমনি করেই তৈরী হ'ল। এর ফলে মেঘের আবরণ হাল্কা হ'য়ে স্বচ্ছ হ'য়ে গেলো। সূর্য্যকিরণ এসে তখন পৃথিবী-পৃষ্ঠে পৌঁছুতে পারল। সৌরতাপে আবার কিছু সমুদ্রজল উদ্বায়িত হয়ে মেঘ হ'ল, তা থেকেও বৃষ্টি হ'ল। সেই আদিম যুগের সমুদ্রজলে অতি সামান্য খনিজ দ্রবিত হয়েছিল। সুতরাং সাগরের জল তখন লবণাক্ত ছিল না মোটেই। সেই জল ছিল সুপেয়। এরপরেই দীর্ঘদিন—লক্ষ লক্ষ বৎসর—ধরে মেঘের সৃষ্টি আর বর্ষণ চল্ল। বৃষ্টির আঘাতে আর প্রবল জলস্রোতে শিলাখণ্ড অতি ধীরে ধীরে ক্ষরিত ক্ষয়িত হয়ে জলধারার সঙ্গে এসে সমুদ্রে হাজির হল, খনিজ লবণে সমুদ্রের জল লবণাক্ত হয়ে গেল।

এর মধ্যে অবশ্য আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। বৃষ্টিজলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস দ্রবিত হয়ে ক্রমাগত কার্বনিক অ্যাসিডে পরিণত হ'ল এবং সেটা জলধারার সঙ্গে এসে সমুদ্রে জমা হ'ল। শুধু বৃষ্টিজলে খনিজ পাথরের যতটা দ্রবিত হয়, কার্বনিক অ্যাসিড জলে থাকলে তার চেয়ে অনেক বেশী দ্রব হয়। সুতরাং সমুদ্রের জলে আরও সহজে খনিজ দ্রব্য এসে গেল। অ্যাসিড হলেও, কার্বনিক অ্যাসিডের অম্লত্ব খুবই কম এবং সঙ্গে কার্বনেট জাতীয় পদার্থ থাকাতে জলের অম্লত্ব থাকেই না। সুতরাং সমুদ্রজল তখন প্রশম (neutral) বা অতি সামান্য ক্ষারীয় হয়ে রইল। কার্বনের পরমাণু অবশ্য অতি সাধারণ, কিন্তু এর একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে যেটা অন্য কোন পরমাণুতে দেখা যায় না। এর একটা প্রধান গুণ এই যে নিজেরই শত শত পরমাণুর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ঘটিয়ে প্রকাণ্ড বড় বড় সব অণুর সৃষ্টি করে নিতে পারে। অর্থাৎ, কার্বন পরমাণুগুলির শৃঙ্খল বা চেন তৈরী করা সম্ভব। এর সঙ্গে জল থেকে পাওয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন, কিংবা নাইট্রোজেন বা অন্যান্য পরমাণু মিলিত হয়ে বহুরকমের জটিল অণু সৃষ্টি করতে পারে। কেউ কেউ মনে করেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরে গলিত ধাতব কার্বাইড [Fe_3C, CaC_2 ইত্যাদি] উত্তপ্ত বাষ্পের সঙ্গে মিলে নানা হাইড্রোকার্বন জাতীয় যৌগ [কার্বন ও হাইড্রোজেনের যৌগ] সৃষ্টি করেছিল। কার্বনিক অ্যাসিড এবং হাইড্রোকার্বন বা এই রকমের কার্বন-ঘটিত যে সব পদার্থ সমুদ্রজলে ছিল সেগুলিই পরবর্তীকালের জৈব পদার্থের আদি উপাদান। সূর্য্যের রশ্মিতে যে অতিবেগুনী আলো থাকে সেটা অক্সিজেন খুব দ্রুত শোষণ করতে পারে। কিন্তু সে সময়ের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন প্রায় ছিলই না, ফলে সূর্যরশ্মির

বেগুনীপারের আলোর অংশ শোষিত হত না। বেশ জোরালো অতিবেগুনী রশ্মি (ultraviolet rays) এসে পৃথিবীর বুকে পেঁছুত, যেটা আজকের দিনে আর সম্ভব নয়। এই অতিবেগুনী রশ্মির সহায়তা নিয়েই কার্বনিক অ্যাসিড থেকে দীর্ঘ এবং জটিল সব অণুর সৃষ্টি হতে লাগল। ঐসব অণুগুলো অবশ্যই অসংখ্য রকমের হয়েছিল, তাদের আকার, আয়তন, প্রকৃতি ইত্যাদিও হল অসংখ্য প্রকারের। এর মধ্যে নিশ্চিতই শর্করা জাতীয় অণুও হয়েছিল, যেমন, গ্লুকোজ,

$$\begin{array}{cccccccccccc} & H & & H & & H & & H & & H & & H \\ & | & & | & & | & & | & & | & & | \\ H- & C & - & C & - & C & - & C & - & C & - & C=O \\ & | & & | & & | & & | & & | & & \\ & OH & & OH & & OH & & OH & & OH & & \end{array}$$
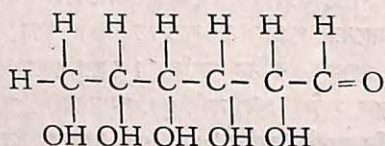
এবং এদের সঙ্গে নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ অ্যামিনো-অ্যাসিড প্রভৃতি মিশে প্রোটিনও দেখা দিয়েছিল। এসব সৃষ্টির কালে কোন কোন খনিজ প্রয়োজন হয়েছিল। সেগুলো তখন সমুদ্রে এসেই ছিল। তীব্র বেগুনীপারের আলো প্রয়োগ করে বাষ্প এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে এ-যুগের ল্যাবরেটরীতে নানা জটিল জৈবপদার্থ উৎপাদন করা গেছে। সুতরাং প্রকৃতিতে ঐ ধরনের প্রক্রিয়া যে হয়েছিল সেটা খুবই সম্ভব।

ঐসব বিরাট দানবীয় আকারের অণুগুলোর মধ্যে আবার নানা ধরণের সংযোগ ঘটতে লাগল ; তারা আরও বড় হ'ল, শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হ'ল, এবং পরস্পরে জড়িয়ে পেঁচিয়ে পড়তে সুরু করল। কার্বন ডাই-অক্সাইড ছিল প্রচুর ; ক্রমাগত দানবীয় আকারের সব অণুর সৃষ্টি চলল যুগযুগ ধরে। ক্রমে সমুদ্রের জল এদের একটা গরম সুপে বা কাইতে পরিণত হয়ে গেল, আর তার মধ্যে সৌরশক্তির খানিকটা সংহত হয়ে রইল। অসম্ভব রকম বড় হয়ে যাওয়ার ফলে সেই বৃহদাকার অণুগুলোর নানা জায়গায় ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনাও দেখা দিল। এই সব জটিল জড়ানো-পেঁচানো অণুগুলো কিন্তু তখন সেই ভাঙ্গাভাঙ্গিকে প্রতিরোধ করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে প্রয়াস পেল। অতিকায় অণুর ভাঙাগড়ার সময় যে তেজের আবির্ভাব হ'ল সেই তেজশক্তি দিয়েই অণুগুলো বিভাজন প্রতিহত করতে সচেষ্ট হ'ল। জড়অণুর এই যে প্রচেষ্টা, বিশেষ উদ্দেশ্যে এই যে শক্তির প্রয়োগ এটাই প্রাণশক্তির প্রথম প্রকাশ। সৌর-শক্তির বিনিময়ে জল, কার্বন-ডাই-অক্সাইড সাহায্যে প্রাণশক্তির বিকাশ ঘটল। জলের প্রশম অবস্থা, সৌররশ্মি, পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা, ইত্যাদি সবকিছুই এর অনুকূল ছিল। সম্পূর্ণ পরিস্ফুট না হলেও এই প্রাণপদার্থ সমুদ্রময় ছড়িয়ে পড়ল। এই আদি প্রাণ-পদার্থকে আমরা নাম দিয়েছি "প্রোটোপ্লাজম"। এর তখনও কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয় নি, একটা ঘন লালার মতো ভেসে আছে জলে। কিন্তু প্রয়োজনে দেহপিণ্ডের খানিকটা প্রসারিত ক'রে আহার সংগ্রহ করে, সংকুচিত হ'য়ে নিজেকে রক্ষা করে, আহার্য্যকে অভ্যন্তরে শোষণ ক'রে জীর্ণ করে। সর্বোপরি নিজেকে খণ্ডিত ক'রে বংশবৃদ্ধি করে। কালক্রমে এমনি করে অ্যামিবা, প্লাংকটন জাতীয় সব এককোষী বা কখনও বহুকোষী প্রাণীপিন্ডের উদ্ভব হ'ল। এইখান থেকে সুরু হ'ল জীবজগতের ক্রম-বিকাশ।

এই আশ্চর্য্য ক্রমবিকাশের দীর্ঘ ইতিহাস আর এক নতুন অধ্যায়, সেটা এখানে আলোচ্য নয়।

প্রথম যে জীবনের বিকাশ ঘটল, তাদের অস্তিত্ব এবং বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড খরচ হ'তে লাগল। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এমনি সংযোজন চলার ফলে বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ গেল খুব কমে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড টেনে নিয়ে প্রাণপিন্ডগুলি ফিরিয়ে দিল অক্সিজেন গ্যাস। আজকের বায়ুতে যে প্রচুর অক্সিজেন সেটা এই সূত্রেই পাওয়া। প্রাণশক্তির বিকাশে উদ্ভিদ ছাড়াও আর এক ধরণের কোষ তৈরী হ'ল যা থেকে আজ প্রাণিজগতের উদ্ভব হয়েছে। এদের প্রয়োজন অক্সিজেন আর এরা ফিরিয়ে দেয় কার্বন-ডাই অক্সাইড, যেটা উদ্ভিদের দরকার। তাই প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে সমতা রক্ষা হচ্ছে আর বাতাসের উপাদানগুলির পরিমাণও নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

এমনি ক'রেই আজকের বায়ুমন্ডল জন্ম নিয়েছে।

পরিমাণ ও বিস্তার ঃ

পৃথিবীর এই গ্যাসের মোড়কটাতে কতখানি বাতাস রয়েছে স্বভাবতঃই সেটা জানতে ইচ্ছে হবে। বিজ্ঞানীরা নানাধরণের পরীক্ষা থেকে পৃথিবীর বায়ুর পরিমাণটা স্থির করেছেন। এর জন্যে বায়ুমণ্ডলের নানা স্তরের চাপ, ঘনত্ব, তাপমাত্রা এসব বের ক'রে নিতে হয়েছে। এখন বলা যেতে পারে বায়ুমন্ডলে গ্যাসের মোটামুটি পরিমাণ 51Gg ; ওজনের এই Gg এককটিকে বলে জিয়োগ্রাম (Geogram)। গ্রহ ইত্যাদির ওজনের পরিমাণ খুবই বেশী, তাই সেটা প্রকাশ করতে আজকাল এই এককটি ব্যবহৃত হয়। 10^{20} গ্রামের সমান হচ্ছে এক জিয়োগ্রাম।

$$1\text{Gg} = 10^{20} \text{ গ্রাম।}$$

∴ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওজন $= 51 \times 10^{17}$ কিলোগ্রাম।

যদি টনের হিসেবে লেখা যায় তবে ওজনটা মোটামুটি হ'বে 5000×10^{12} টন, অর্থাৎ পাঁচ হাজার মিলিয়ন মিলিয়ন টন।

অঙ্কবিদেরা সংখ্যা দিয়ে সব কিছু তুলনা করতে আর মাপজোক করতে ভালবাসেন। ধরা যাক, অতিরিক্ত চাপ দিয়ে আর খুব ঠান্ডা করে সমস্ত বাতাসটাকে তরল বা কঠিনাকারে নিয়ে আসা গেল। তখন সেই বাতাসটাকে যদি প্রতিদিনে 10,000 টন করে ওয়াগনে ভর্তি করে দেয়া যায়, তাহ'লে সব বাতাসটাকে ওয়াগনে ভরে নিতে সময় লাগবে 1250,000,000 বছর।

এই ধরণীর একচ্ছত্র সম্রাট মানুষ। অন্যান্য জীবজন্তু আছে বটে, তবে মানুষই সমস্ত পৃথিবীটাকে ভাগ বাটোয়ারা করে অধিকার করে নিয়েছে। চারদিকের বাতাসটাও পৃথিবীর। আর এই পৃথিবীতে লোকসংখ্যা (1972) অন্ততঃ 3800,000,000, আর ভূপৃষ্ঠের বর্গায়তন 197,000,000 বর্গমাইল। তার অর্থ, প্রতি বর্গমাইলে গড়ে 20টি মানুষ রয়েছে। আর প্রতি বর্গমাইলের উপরের বাতাসের পরিমাণ 25,000,000

টন। অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলীতে পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোকের জমিদারীর পরিমাণ প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ টন বাতাস।

হঠাৎ মনে না হ'লেও বায়ুমণ্ডলের ওজন যথেষ্টই। এখন এই ওজনটাকে পৃথিবীর কঠিন দেহটার ওজনের সঙ্গে তুলনা করা যাক্। পৃথিবীর ওজন হচ্ছে, 5×10^7 Gg, অর্থাৎ $5{\cdot}8 \times 10^{21}$ টন।

দেখা যাচ্ছে, বায়ুমণ্ডলের ওজন পৃথিবীর তুলনায়,

$$\frac{51\text{Gg}}{5 \times 10^7\text{Gg}} \approx \frac{1}{10^6},$$

দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

ওজনের দিকটা ছেড়ে এখন আয়তনের দিকটাতে আসা যাক্। মহাসাগরের তীরে দাঁড়ালে তার দিগন্ত প্রসারিত বিরাটত্ব দেখে আমরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যাই। যে বাতাসে আমরা সারাক্ষণ থাকি সেই বায়ুসমুদ্রের বিস্তার ও তেমনি সীমাহীন। বাতাস স্বচ্ছ, তাই বায়ুমণ্ডলের সীমানাটা বুঝে উঠ্‌তে পারা যায় না, তার বিশাল পরিধির কথা মনে জাগে না। বাতাস কিন্তু জুড়ে আছে সাগরের চেয়ে আরও অনেক বেশী স্থান। সমুদ্র ধরণীতলের অধিকার করেছে প্রায় সত্তর শতাংশ আর বাতাস রয়েছে সম্পূর্ণ ভূপৃষ্ঠের ওপরে। সমস্ত ভূতলের ওপরেই তার অবস্থান, আর উপরের দিকে কোথায় যে তার সীমানা বলা শক্ত। বায়ুমণ্ডলের ওপরের ছাত কোথায়? ধরিত্রীর বুক থেকে উপরের দিকে প্রায় দু'শ কিলোমিটার পর্য্যন্ত ত' মানুষ বাতাসের নানা পরীক্ষাই করেছে, বেলুন, রকেট এসবের সাহায্য নিয়ে। তারও ওপরে অন্ততঃ 500 কিলোমিটার পর্য্যন্ত বাতাসের অস্তিত্ব নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে, যদিও সেখানে বাতাস বড়ই হাল্‌কা; তারও উপরে বাতাস চলে গেছে গ্রহলোকের শূন্যপ্রায় অবকাশে। এর সঙ্গে যদি মহাসাগরের তুলনা করি, প্রশান্ত মহাসাগর, যার গভীরতা সর্বাধিক, তার গভীরতম অংশ মাত্র এগারো কিলোমিটার।

কিন্তু তবু বলতে হ'বে, পৃথিবীর এই গ্যাসের ওড়নাটা তার কঠিন দেহের তুলনায় খুব বেশী কিছু নয়। যদি ধরে নেয়া যায় বায়ুমণ্ডলের ওপরের সীমানা 500 কিলোমিটার পর্যান্ত, তা হ'লেও তার পরিধি কিছু অসামান্য রকমের প্রকাণ্ড নয়। পৃথিবীর ব্যাস প্রায় আট হাজার মাইল। তা হ'লে কিলোমিটারে হবে 12800 কিলোমিটার আর তার মধ্যে রয়েছে তিনটি স্তর: ভূত্বক, ডুনাইট শিলার মধ্যান্তর আর কেন্দ্র-অঞ্চল। ভূত্বক খুবই কম, দশ-পনেরো কিলোমিটার পুরু। সেটা ঘিরে রয়েছে কঠিন শিলাময় অন্তঃস্তরকে, যেটার বেধ অন্ততঃ 2900 কিলোমিটার। এবং উত্তপ্ত অন্তরতম প্রদেশের কেন্দ্রের ব্যাসার্ধ প্রায় 3400 কিলোমিটার। সুতরাং এর তুলনায় বায়ুমণ্ডলের আয়তন বেশী নয়। চিত্র ১০ থেকে একটা মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে।

বাতাস কিন্তু সব জায়গাতে একরকম ঘন হয়ে নেই। উপরের দিকে যতই যাওয়া যাবে, বাতাস ক্রমশঃ হাল্‌কা দেখা যাবে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ফলে বেশীর ভাগ বাতাস রয়েছে ভূপৃষ্ঠের কাছে। এই অভিকর্ষের জন্য ভূপৃষ্ঠের

কাছের বাতাস খুব ঘন আর উঁচুতে বাতাস অনেক লঘু। বাস্তবিক পক্ষে সম্পূর্ণ বায়ুর অর্ধেকটাই রয়েছে মাটি থেকে প্রথম সাড়ে তিন মাইলের অর্থাৎ ছয় কিলোমিটারের
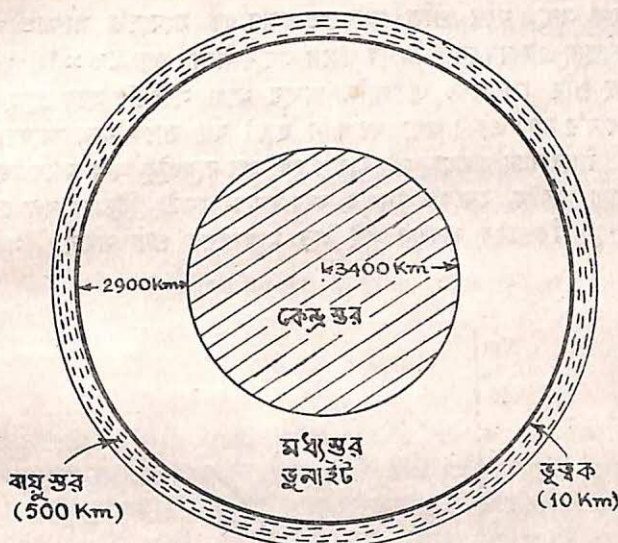
চিত্র-১০· বায়ুমণ্ডল আবৃত পৃথিবী ·

মধ্যে। মাটি থেকে মানে এখানে মনে করতে হবে সমুদ্র-সমতল থেকে। আঠার মাইলের মধ্যে বাতাসের শতকরা নব্বই ভাগ রয়েছে। তারপরে বাকী অংশটুকুই, অর্থাৎ আর দশ শতাংশ, ছড়িয়ে গেছে ক্রমে ক্রমে মহাশূন্যের দিকে।

মাটির কাছের যে বাতাসে আমরা রয়েছি সেটা হাইড্রোজেনের চেয়ে প্রায় 14·4 গুণ ভারী। হাইড্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, কারণ হাইড্রোজেন পৃথিবীর লঘুতম গ্যাস, তাই অন্য সব গ্যাসের ঘনত্ব ওর সঙ্গেই তুলনা করার রীতি। অন্যান্য জিনিস কতটা ভারী সেটা প্রকাশ করতে হ'লে জল আমাদের মাপকাঠি। জলের ঘনত্ব, অর্থাৎ এক ঘন সেন্টিমিটার (1c.c.) জলের ওজন, এক গ্রাম। এই হিসাবে বাতাসের ঘনত্ব হ'বে মাত্র 0·00129 গ্রাম। এই হিসাবে পৃথিবীর গড় ঘনত্ব দেখা গেছে, 5·52 গ্রাম। উচ্চতার সঙ্গে বাতাসের ঘনত্ব খুব দ্রুত কমে যায়, তাই পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে গেলে হাঁপ্ ধরে যায়। এর কারণ বাতাস হাল্কা, সুতরাং অক্সিজেনের পরিমাণ কম, সেই হেতু শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয়। এই কারণেই পর্ব্বত-অভিযানে অক্সিজেনের বোতল নিয়ে যেতে হয়।

উপরের দিকে বাতাসের এই ঘনত্ব কমে যাওয়ার কথাটা আর একদিক থেকে ভেবে দেখা যেতে পারে। বাতাসের মধ্যে রয়েছে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি নানা গ্যাস।

এদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুগুলি নিরন্তর ভীষণবেগে ছোটাছুটি করে আর এই ছোটাছুটির সময় পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাও লাগে। মাটির কাছের বাতাসে প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে থাকে অসংখ্য অণু, ফলে প্রতি সেকেণ্ডে আণবিক সংঘর্ষের সংখ্যাও খুব বেশী। সাধারণ অবস্থায় এক ঘন সেন্টিমিটার গ্যাসে অণুর সংখ্যা প্রায় $2{\cdot}6\times10^{19}$। সহজেই বোঝা যাচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে এতগুলি অণুর মধ্যে সংঘর্ষও হবে প্রচুর। পর পর দুইটি সংঘর্ষের মধ্যে একটা অণু যতখানি ছুটে যায় তাকে বলে "মুক্তপথ" (free path)। বিজ্ঞানীরা গ্যাসের এই মুক্তপথের গড় দূরত্বটুকু অঙ্ক ক'ষে স্থির করেছেন এবং অন্যান্য পরীক্ষা থেকেও নির্ণয় করেছেন। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, দুইটি অণুর ভিতরের ব্যবধান এই গড় মুক্তপথের প্রায় সমান। মাটির কাছের
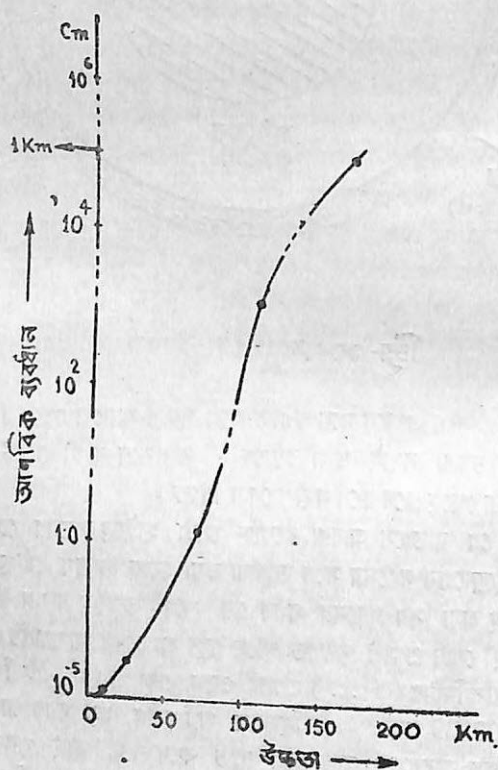
চিত্র ১১। বিভিন্ন উচ্চতায় অণুগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব

বাতাসের অণুগুলির মধ্যে ব্যবধান দেখা গেছে প্রায় 1×10^{-5} সেন্টিমিটার। কোন মুহূর্তে একটা অণু থেকে নিকটতম আর একটা অণু গড়ে 0·00001 সেন্টিমিটার

দূরে থাকবে। তাহ'লে এক সেন্টিমিটার গেলে একটি অণুর সঙ্গে এক লক্ষ অণুর দেখা হবে। এ হিসেবটা আমাদের চারদিকের মাটির কাছের বাতাসের। কিন্তু যদি দু'শো কিলোমিটার উপরে উঠে যাওয়া যায় তখন বাতাস এত হাল্‌কা যে দুইটি অণুর ব্যবধান হবে এক কিলোমিটার। অর্থাৎ, একটা অণু এক কিলোমিটার ছুট্‌লে আর একটা অণুর দেখা পাবে। এ থেকে বোঝা যায় উপরের বাতাস কত বিরল আর কত লঘু (চিত্র ১১)!

আর একটা হিসেবে দেখা গেছে, যদি সমস্তটা বায়ুমন্ডলের গ্যাস একত্র থাকত, মাটির কাছের বাতাসের ঘনত্ব নিয়ে, তা হ'লে সেই গ্যাসের মোড়কটা মাত্র আট কিলোমিটার পুরু হ'ত, তার বেশী নয়। আর যদি চাপ দিয়ে সব বাতাসটাকে জলের ঘনত্বে নিয়ে আসা যায়, তবে সেটা মাত্র দশ মিটারের একটা আবরণ হ'য়ে পৃথিবীকে ঘিরে থাকবে।

উপাদান

এখন অবশ্য সবাই জানে বাতাস একটা গ্যাসের মিশ্রণ। নানা রকম গ্যাস মিশে বাতাস তৈরী, তার মধ্যে নাইট্রোজেন আর অক্সিজেনই প্রধান। সেই হিন্দু সভ্যতার যুগ থেকে মানুষের ধারণা ছিল পৃথিবীর সব কিছু পাঁচটি আদি পদার্থ থেকে উদ্ভূত —ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ আর ব্যোম্‌। মরুৎ অর্থাৎ বাতাস তাই একটা মৌলিক পদার্থ বলে গণ্য হত। মাত্র দু'শ বছর আগে ল্যাভয়সিয়ার, প্রিষ্টলী, শীলে, এসব বিজ্ঞানীদের নানা পরীক্ষা থেকে দেখা গেল, বাতাসে অন্ততঃ দু'রকম গ্যাস রয়েছে। এর একটা ভাগ—আনুমানিক এক-পঞ্চমাংশ—সব কিছুর দহনে অংশ নেয়। বাকী গ্যাসটুকুর সে ক্ষমতা নেই। দহন-সহায়ক প্রথম ভাগটাকে বলি অক্সিজেন, আর যেটা দহন সমর্থন করে না, সেটা নাইট্রোজেন।

চিত্র ১২। অক্সিজেনে মোমবাতির দহন

এ ব্যাপারটা একটা খুব সহজ পরীক্ষা করেই প্রমাণ করে দেওয়া যায়। একটা বড় খোলা পাত্রে বা গামলায় জল নিতে হবে। এই জলের উপরে একটা কর্কে মোমবাতি বসিয়ে জ্বালিয়ে দিতে হবে। তারপর সেই বাতিটি একটি সিলিণ্ডার বা বড় মুখের বোতল দিয়ে চাপা দিতে হবে (চিত্র ১২)। সিলিণ্ডারটি যদি ওষুধের শিশির মত কাগজ দিয়ে পাঁচ ভাগে দাগ কেটে নেয়া যায় তাহ'লে আরও সুবিধা হবে। দেখা যাবে মোমটা যখন জ্বলতে থাকবে ধীরে ধীরে সিলিণ্ডারের ভেতরে জলের তলটা উঠ্‌তে থাকবে। খানিকক্ষণ পরে মোমবাতিটা নিভে যাবে। এর কারণ অক্সিজেন আর নেই, বাতি জ্বলবার সময় শুষে নিয়েছে। তখন সিলিণ্ডারের পাঁচ ভাগের এক ভাগ জলে ভরতি হয়ে গেছে। বাকী 4/5-অংশে গ্যাসটাতে কিছু পুড়তে পারে না।
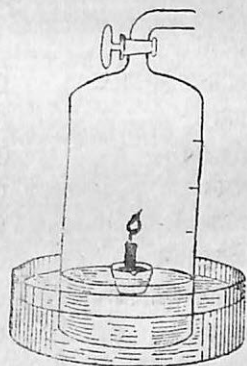
এমনকি একটা ছোট ইঁদুর বা ফড়িং এতে রেখে দিলে সেটাও মরে যাবে, অক্সিজেন অভাবে। এই অবশিষ্ট চারভাগ গ্যাস হচ্ছে নাইট্রোজেন।

অক্সিজেন নাইট্রোজেন ছাড়া আরও কতকগুলি গ্যাস খুব কম পরিমাণে বাতাসে রয়েছে। এরা হচ্ছে কার্বন-ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প আর নিষ্ক্রিয় গ্যাস, যথা, আরগন, হিলিয়াম, নিয়ন, ক্রিপ্টন, জিনন। এদের কতকগুলি গ্যাস আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন, এরা আছে বলেই আমাদের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। আবার কোন কোন গ্যাসকে আমরা নিজেদের কাজে লাগিয়েছি। এ ছাড়াও অতি সামান্য পরিমাণে রয়েছে মিথেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেনের অক্সাইড।

আর একটা কথাও মনে রাখা দরকার। গ্যাস ছাড়াও বাতাসে মিশেল হয়ে রয়েছে প্রচুর ধূলিকণা এবং কিছু তরল বস্তুকণা, যেমন তেলের কণা, জলের কণা ইত্যাদি। এসব কঠিন এবং তরল বস্তুকণাকে বায়ুর অপদ্রব্য বা মালিন্য বলা যেতে পারে, কিন্তু এদেরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

বাতাসের উপাদানগুলির অনুপাত

উপাদান	ওজন-অনুপাত (শতাংশ)	আয়তন-অনুপাত (শতাংশ)	আয়তন-অনুপাত (দশ লক্ষ ভাগে)
নাইট্রোজেন	75.51	78.09	
অক্সিজেন	23.15	20.95	
আরগন	1.28	0.93	
কার্বন-ডাইঅক্সাইড	0.046	0.03	
নিয়ন	0.00125		18.1
হিলিয়াম	0.000072		5.2
মিথেন	0.000094		1.5
ক্রিপ্টন	0.00029		1.0
হাইড্রোজেন	0.0000035		0.5
নাইট্রাস অক্সাইড	0.00008		0.5
জিনন	0.000036		0.08

বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার বা প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করার আগে এরা কি অনুপাতে আছে সেটা দেখা প্রয়োজন। উচ্চতার সঙ্গে বাতাসের ঘনত্ব কমে যায়, বাতাস হাল্‌কা হয়ে পড়ে, সেটা ঠিক। কিন্তু মাটি থেকে প্রায় 40 মাইল পর্যন্ত যে কোন উচ্চতায় বাতাস পরীক্ষা করলে দেখা যায় বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাতটি মোটামুটি একই রয়েছে। এই চল্লিশ মাইলের মধ্যেই বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশই রয়েছে ; আঠার মাইলের উচ্চতার মধ্যেই রয়েছে শতকরা 90 ভাগ। অনেক উঁচুতে 70/80 মাইল বা তারও উপরের বাতাসটা ঠিক আমাদের এই ভূতলের বাতাস নয়। সেখানে

বাতাস আছেও খুব কম, যা আছে তাও প্রধানতঃ আয়নিত অবস্থায় থাকে। তাদের ভৌতিক অবস্থাটাই অন্যরকমের, বায়ুমণ্ডলের অংশ হ'লেও সেগুলো ঠিক আমাদের চারদিকের বাতাসের মতো নয়। এখানকার বাতাসের গ্যাসীয় উপাদানগুলির অনুপাতের একটা তালিকা (পৃঃ ২০) দেওয়া হ'ল। তালিকাতে উপর থেকে প্রথম চারটি গ্যাসই বেশী পরিমাণে আছে। অপর গ্যাসগুলির পরিমাণ তুলনায় অতি সামান্য। বাতাসে জলীয় বাষ্প ত' রয়েছেই, কিন্তু সেটা এখানে ধরা হয়নি, কারণ স্থানবিশেষে এবং উষ্ণতার সঙ্গে ত' বটেই, এর পরিমাণটা বিভিন্ন হয়ে থাকে। জলীয় বাষ্পের কথা পরে আমরা আলাদা আলোচনা করব। অনুপাতের যে তালিকাটি এখানে দেওয়া হ'ল সেটা অনার্দ্র বাতাসের ধরতে হবে।

বাতাসের মধ্যে এই গ্যাসগুলি শুধু মিশে রয়েছে, তাদের মধ্যে কোন রাসায়নিক সংযোগ নেই। অর্থাৎ নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন মিশে আছে মাত্র, নাইট্রোজেনের কোন অক্সাইড হ'য়ে নেই। যদি গ্যাসগুলির মধ্যে রাসায়নিক সংযুতি থাকত তবে যৌগ পদার্থ হ'ত। যৌগ পদার্থের উপাদানগুলির ওজন-অনুপাত সুনির্দিষ্ট এবং তার ব্যতিক্রম কিছুতেই হবে না। যেমন লবণে সোডিয়াম এবং ক্লোরিন 23 ঃ 35·5 এই অনুপাতে আছে, যে অবস্থাতেই লবণ থাকুক এই অনুপাতটি স্থির থাকবেই। কিন্তু বাতাসে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের অনুপাত সর্ব্বদা নির্দিষ্ট থাকে না। বাতাসে এই দুইটি গ্যাসের মোটামুটি ওজন-অনুপাতে 75 ঃ 23। কিন্তু যখন বাতাস জলে দ্রব হয়ে থাকে, তখন নাইট্রোজেন-অক্সিজেনের অনুপাত দেখা যায় মোটামুটি 66 ঃ 33। বাতাস জলে অবশ্য কিছু দ্রব হয়ে থাকে ; তা না হলে মাছ এবং অন্যান্য জলচর প্রাণীর শ্বাসকার্য্য অসম্ভব হ'ত এবং তাদের অস্তিত্ব লোপ পেত। গ্যাসীয় বাতাস এবং জলে দ্রব বাতাসের উপাদানগুলির অনুপাতের বৈষম্য থেকেই বোঝা যায় বাতাস যৌগ পদার্থ নয়, একটি গ্যাস-মিশ্রণ মাত্র। এবারে আলাদা ক'রে উপাদান-গুলোর পরিচয় এবং প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা যাক।

নাইট্রোজেন

বাতাসের উপাদানগুলির মধ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণই সর্বাধিক। বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের মোট পরিমাণ 38·6 Gg বা $3{\cdot}86 \times 10^{18}$ কিলোগ্রাম। কিন্তু এর চেয়েও অনেক বেশী (প্রায় চল্লিশগুণ) নাইট্রোজেন রয়েছে কঠিন শিলা আর মাটির সঙ্গে নানারকম যৌগের আকারে। একটা উদাহরণ দিলেই হবে। শোরা একটি নাইট্রোজেনের যৌগ, সোডিয়াম নাইট্রেট ($NaNO_3$)। কেবলমাত্র চিলির উপত্যকায় খনিজ শোরাতেই নাইট্রোজেন রয়েছে 5×10^9 কিলোগ্রাম।

নাইট্রোজেন মৌলটির রাসায়নিক সক্রিয়তা একটু কম, খুব সহজে অক্সিজেনের মতো এটা সরাসরি অন্য পদার্থের সঙ্গে মিলিত হ'তে চায় না। কিন্তু তাহ'লেও জীবজগতের বিকাশ আর বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেন এক গুরুতর ভূমিকা গ্রহণ করে। জীবদেহ গঠিত নানারকমের কোষ দিয়ে, তার মধ্যে রয়েছে প্রাণের উৎস প্রোটোপ্লাজম। প্রোটোপ্লাজম আবার তৈরী হয়েছে অত্যন্ত জটিল কতগুলো জিনিস দিয়ে, যার অন্যতম হচ্ছে প্রোটিন।

এই প্রোটিনে আছে নানা ধরণের অ্যামিনো-অ্যাসিড এবং এরা সবাই নাইট্রোজেন-সঞ্জাত যৌগ পদার্থ। কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ—প্রত্যেকেরই প্রোটিন, অতএব অ্যামিনো-অ্যাসিড, প্রয়োজন। উদ্ভিদেরা সচরাচর মাটি থেকে শিকড়ের সাহায্যে অ্যামোনিয়াম-যৌগ টেনে নেয় এবং পরে সেটাকে অ্যামিনো-অ্যাসিড ও প্রোটিনে পরিণত করে। কয়েকটি উদ্ভিদ আছে, যেগুলো সরাসরি বাতাসের নাইট্রোজেনকে গ্রহণ করে এবং তা থেকে প্রোটিন উৎপাদন করতে পারে। পরে এদের কথায় আসছি।

দেখা যাচ্ছে, প্রোটিনের জন্যে প্রাণী এবং উদ্ভিদ উভয়েরই নাইট্রোজেন খুবই প্রয়োজন। অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় বলে বাতাসের নাইট্রোজেনকে সরাসরি কাজে লাগান বা প্রাণীদেহে তার রাসায়নিক মিলন ঘটান সম্ভব নয়। তাই প্রকৃতিই এর সমাধানের ব্যবস্থা করেছে। প্রকৃতির কতকগুলি ঘটনা এমনভাবে সংঘটিত হয়, যাতে বাতাসের নাইট্রোজেন যৌগে পরিণত হ'য়ে জীবজগতের পক্ষে সহজলভ্য হ'য়ে পড়ে। প্রধানতঃ এটা হয় দুই রকমে।

(১) বায়ুমণ্ডলে উপরের স্তরে সর্ব্বদাই ছোট বড় বিদ্যুৎক্ষরণ চলছে। এর ফলে সেখানকার নাইট্রোজেন আর অক্সিজেনের মিলন ঘটে, নাইট্রিক অক্সাইডের (NO) সৃষ্টি হয়। নাইট্রিক অক্সাইড আবার আরও খানিকটা অক্সিজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইড গ্যাসে (NO_2) পরিণত হয়। এই গ্যাস তারপর বৃষ্টির জলে দ্রব হয় এবং নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরী করে। বৃষ্টির সঙ্গে এই অ্যাসিড এসে যখন মাটিতে পড়ে তখন জমির ক্ষারীয় উপাদানের দ্বারা প্রশমিত হ'য়ে বিভিন্ন নাইট্রেট লবণের সৃষ্টি হয়। এই নাইট্রেট কতগুলি জটিল প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রথমে অ্যামোনিয়াম যৌগে পরিণত হয়। উদ্ভিদ তা থেকে অ্যামিনো-অ্যাসিড এবং প্রোটিন তৈরী করে নেয়।
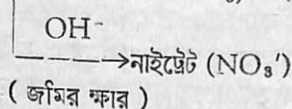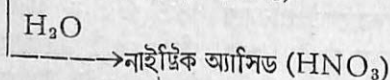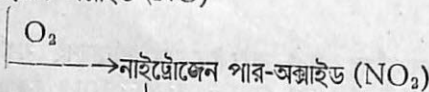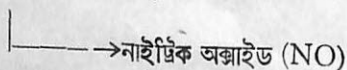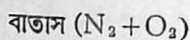
এমনি ক'রেই বাতাসের নাইট্রোজেন নিরন্তর নাইট্রেটের মাধ্যমে উদ্ভিদের প্রোটিনে চলে যাচ্ছে। একটা মোটা হিসেবে দেখা যায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় ষোল লক্ষ কুইন্টাল নাইট্রোজেন এভাবে জমিতে চলে যায়।

(২) দ্বিতীয় উপায়টি হচ্ছে লিগুইমিনাস জাতীয় উদ্ভিদের সাহায্যে। সিম্, মটর ইত্যাদি উদ্ভিদ এই জাতের। এসব গাছের শিকড়ের উপরে এক ধরণের অঙ্কুর জন্মায়, এদের বলা হয় নডিউল (nodules)। হেল্‌রাইগেল (Hellreigel, 1887) সর্বপ্রথমে দেখান, এ জাতীয় উদ্ভিদ এই নডিউলের ভেতর দিয়ে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন বায়ু থেকে গ্রহণ করে। এই নডিউলের মধ্যে থাকে অ্যাজোটোব্যাক্‌টার (azotobacter) জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া। বাইজারিঙ্ক (Beijerinck, 1901) প্রমাণ ক'রে দেন এই ব্যাক্‌টিরিয়ার সাহায্যেই বাতাসের নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়াম যৌগে পরিণত হ'য়ে যায়। কি ক'রে এই রাসায়নিক পরিবর্তনটি ঘটে সেটা খুব পরিষ্কার ভাবে আজও বোঝা যায়নি। তবে রাইজোবিয়াম (Rhizobium), ক্লষ্ট্রিডিয়াম বুটিরিকাম (Chlostridium Butyricum) প্রভৃতি ব্যাক্‌টিরিয়া যে নাইট্রোজেনকে যৌগে পরিণত করতে সাহায্য করছে সেটা নিঃসন্দেহ।

লিগুইমিনাস জাতীয় উদ্ভিদ ছাড়াও অনেক রকম সবুজ সমুদ্র-শৈবাল বা অ্যালজী (algae) সরাসরি বাতাসের নাইট্রোজেনকে টেনে নিতে পারে এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যে পরিণত করতে পারে। বাঙালী বিজ্ঞানী ডঃ প্রাণকুমার দে (1939) প্রথম প্রমাণ করেন অ্যানাবেনা শৈবাল কোষেও নাইট্রোজেন শোষিত হয়ে সরাসরি যৌগে পরিণত হয়। এ ছাড়াও নসটক (Burris, 1943), সিলিন্ড্রোস্পারমাম (Bortels, 1940) প্রজাতির অ্যালজীরা যে এমনি করে নাইট্রোজেন থেকে সরাসরি খাদ্য তৈরী ক'রে নেয় তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এই দুইটি উপায়ে বাতাসের নাইট্রোজেনকে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনে লাগায়। জন্তুরা উদ্ভিদ থেকে তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে এবং নিজেদের প্রোটিন সঞ্চয় করে। জন্তুদের ভিতর যারা মাংসাশী তারা আবার অপর জন্তুর মাংস, ডিম, দুধ থেকে নিজেদের প্রোটিন পায়। মানুষ তার প্রোটিন তৈরী করে উদ্ভিদ এবং অন্যান্য পশুজাত দ্রব্য থেকে।

প্রাকৃতিক দু'টি উপায়ে যে নাইট্রোজেন বাতাস থেকে জীব জগতে চলে আসে তার পরিমাণ খুব কম নয়—বছরে গড়ে প্রায় 5×10^{10} কিলোগ্রাম। এর ফলে মনে হবে কালক্রমে বাতাসের নাইট্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস পাবে। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের পরিমাণ মোটামুটি স্থির রয়েছে। এর কারণ, কতকগুলি বিপরীত ক্রিয়াও প্রকৃতিতে সর্ব্বদা ঘটছে এবং তার ফলে নাইট্রোজেন মৌলের উৎপাদন হচ্ছে। উদ্ভিদ বা জীবজন্তুর ধ্বংসের পর তাদের পচন শুরু হয়। এতে ওদের প্রোটিনগুলো অ্যামোনিয়া বা অ্যামোনিয়াম যৌগে পরিণতি লাভ করে। প্রাণিদেহের নিঃসৃত মলমূত্র ইত্যাদি থেকেও প্রচুর অ্যামোনিয়া নিরন্তর তৈরী হচ্ছে। জমিতে যখন এই সব পচনশীল পদার্থ থাকে তখন নানারকম ব্যাকটিরিয়া তাদের আক্রমণ করে। নাইট্রোসোমোনাস (Nitrosomonas) প্রথমে অ্যামোনিয়াকে জারিত করে দেয় নাইট্রাইটে। তারপর নাইট্রোব্যাকটার (Nitrobacter) নাইট্রাইটকে নাইট্রেটে রূপান্তরিত করে। অর্থাৎ জীবজগৎ থেকে আবার নাইট্রেট জমিতে ফিরে এল। এই

নাইট্রেটকে উদ্ভিদ আবার খাদ্যে পরিণত করে। এ কথাটাই কবিগুরু সুন্দর করে বলেছেন ঃ

> "Dead leaves when they lose themselves in soil
> take part in the life of the forest."
> (Fireflies. 265)

খানিকটা নাইট্রেট আবার জমির কোন কোন ব্যাকটিরিয়ায় আক্রান্ত হ'য়ে নাইট্রোজেন গ্যাস হ'য়ে বাতাসে ফিরে আসে। এভাবেই নাইট্রোজেন বায়ু থেকে অপসারিত হ'য়ে জীবজগতে প্রবেশ ক'রে আবার জীবজগতের ধ্বংস আর পচনের ফলে বায়ুতে ফিরে আসে। এটাকে বলা হয় নাইট্রোজেনের প্রাকৃতিক বিবর্তন-চক্র। প্রকৃতিতে এই বিপরীত ঘটনাগুলির মধ্যে এমন একটা সঙ্গতি রয়েছে, যে বায়ুতে নাইট্রোজেনের অনুপাতের কোনই ব্যতিক্রম হয় না। চিত্র ১৩ থেকে এই বিবর্তন-চক্রের একটা ধারণা হবে।
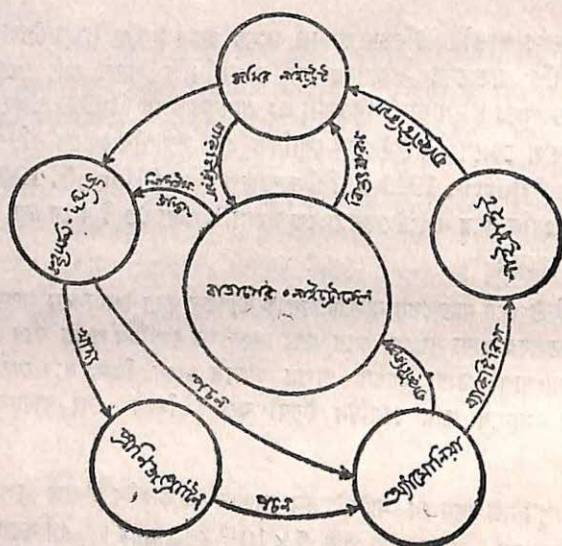
চিত্র ১৩। নাইট্রোজেনের বিবর্তন-চক্র

কিন্তু আজকের দিনে মানুষের নাইট্রোজেন-সঞ্জাত যৌগের প্রয়োজন অনেক। এর কয়েকটি কারণও আছে। (১) লোকসংখ্যা প্রচুর বেড়ে গিয়েছে, তাই খাদ্যের প্রয়োজন বেশী। জমির উৎপাদন-শক্তি বাড়ান দরকার। এর জন্যে কৃত্রিম সার, বিশেষ ক'রে নাইট্রোজেন-সারের প্রয়োজন, সুতরাং অ্যামোনিয়াম লবণের বিস্তর চাহিদা এবং সেটা বাতাসের নাইট্রোজেন থেকেই তৈরী হচ্ছে। (২) বর্তমানের উন্নত জীবনযাত্রার অনেক উপকরণ তৈরী করতে নাইট্রিক অ্যাসিডের প্রয়োজন। (৩) আধুনিক সমরোপকরণের একটি প্রধান প্রয়োজন বিস্ফোরক আর অধিকাংশ বিস্ফোরকই নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে তৈরী করা হয়।

অ্যামোনিয়া বা নাইট্রিক অ্যাসিডের এই চাহিদা প্রকৃতির স্বাভাবিক দানে সঙ্কুলান

হয় না এবং সেটা সহজে পাওয়াও যায় না। সেই জন্যে বাতাসের অফুরন্ত নাইট্রোজেনের সামান্য খানিকটা যৌগে পরিণত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন উপায়ে বায়ুর নাইট্রোজেনকে যৌগে পরিণত ক'রে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন। এই পদ্ধতিকে বলা হয় নাইট্রোজেন-বন্ধন।

এ শতাব্দীর গোড়াতে বার্কল্যান্ড এবং আইড নাইট্রোজেন-বন্ধনের প্রথম উপায়টি উদ্ভাবন করেন; প্রকৃতিকে অনুকরণ ক'রে খুব জোরালো বিদ্যুৎ-শিখার মধ্য দিয়ে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের একটা মিশ্রণ চালনা করে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরী করেন। এটা থেকে নাইট্রিক অ্যাসিড সহজেই পাওয়া যায়। অতিরিক্ত ব্যয় এবং অনেক বেশী বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন হয় বলে এখন আর কোথাও এ পদ্ধতিটির প্রচলন নেই।

আজকাল বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া সর্ব্বত্র প্রস্তুত হয় হেভার পদ্ধতিতে। অতিরিক্ত চাপ এবং তাপমাত্রাতে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের মিশ্রণ লৌহচুর প্রভাবকের (catalyst) উপর দিয়ে পরিচালনা করলে সহজেই অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। এই-ই হেভার পদ্ধতি। অ্যামোনিয়ার নানারকমের লবণ জমিতে সার হিসেবে দেওয়া হয়; বিশেষ ক'রে অ্যামোন-সাল্‌ফ $(NH_4)_2SO_4$। সিন্ধ্রিতে এর কারখানা রয়েছে। ইউরিয়া নামক প্রধান নাইট্রোজেন-সারও এই অ্যামোনিয়া থেকেই তৈরী করা হয়। অ্যামোনিয়া থেকে আবার অল্প-আয়াসেই নাইট্রিক অ্যাসিডও পাওয়া যায়।

বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন করার আরও উপায় রয়েছে। সেগুলিরও অল্পাধিক প্রয়োগ হয়। সারপেক্ প্রণালীতে বিচূর্ণ বক্সাইট খনিজ এবং কোকের মিশ্রণ নাইট্রোজেন গ্যাসে প্রায় 1800^0C-এ উত্তপ্ত করলে অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রাইড হয় এবং তা থেকে জলের সাহায্যে অ্যামোনিয়া তৈরী হয়। বক্সাইট ত' আমাদের দেশে প্রচুর। এ ছাড়া, সায়নামাইড-প্রণালীতে ক্যালসিয়াম কার্বাইড নাইট্রোজেন গ্যাসে তাপিত করলে ক্যালসিয়াম সায়নামাইড ও কার্বন মিশ্রণ পাওয়া যায়। একে বলে নাইট্রোলিম। (চুন আর কয়লা থেকে ক্যালসিয়াম কার্বাইড তৈরী ক'রে নিতে হয়।) নাইট্রোলিম সরাসরি জমিতে সার হিসেবে দেয়া যায়। নাইট্রোলিম থেকে আবার খুব সহজে অ্যামোনিয়াম লবণও পাওয়া সম্ভব। বাতাসের নাইট্রোজেন কিভাবে আমাদের প্রয়োজনে আস্‌ছে সেটা বুঝবার জন্যেই এসব উল্লেখ করা। রাসায়নিক সংকেতে এ পদ্ধতিগুলি আরও সহজে বলা যায়।

রাসায়নিক ক্রিয়া	পদ্ধতি
a) $N_2+O_2 = 2NO-43200$ cal	[বার্কল্যান্ড-আইড]
b) $N_2+3H_2 = 2NH_3+24000$ cal	[হেভার]
c) $Al_2O_3+3C+N_2 = 2AlN+3CO$	[সারপেক]
d) $CaC_2+N_2 = CaCN_2+C$	[নাইট্রোলিম]

আর একটি কথা। এর আগেই আমরা দেখেছি, বাতাসে সামান্য পরিমাণে নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) আছে এবং এর অনুপাতটিও নির্দ্দিষ্ট। এখন জানা গেছে, বাতাসে নাইট্রাস অক্সাইড আস্‌ছে, জমিতে ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে অ্যামোনিয়া যখন নাইট্রাইটে

পরিণত হয়, সেখান থেকে। নাইট্রাইট তৈরী হওয়ার সময় খানিকটা হাইপো-নাইট্রাস্ অ্যাসিড ($H_2N_2O_2$) হয় এবং সেটা ভেঙে গিয়ে নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস বাতাসে চলে আসে।

$$H_2N_2O_2 \longrightarrow N_2O + H_2O$$

হাইপো-নাইট্রাস অ্যাসিড নাইট্রাস অক্সাইড
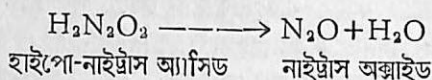
নাইট্রাস অক্সাইড এমনি বেশ স্থায়ী, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে এসে যখন এটা অতি-বেগুনী রশ্মির সংস্পর্শে আসে, তখন সেটা ভেঙে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনে পরিণতি লাভ করে।

$$N_2O + h\nu = N_2 + O$$
$$N_2O + O = N_2 + O_2$$
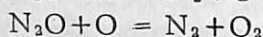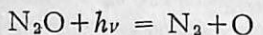
জমির অ্যামোনিয়া থেকে নাইট্রাস অক্সাইডের উৎপাদন-হার এবং বায়ুর উপরের স্তরে ওর আলোক-রাসায়নিক বিভাজনের হার (Photochemical decomposition), এই দুইটির ভিতর একটা সমতা রয়েছে, যার জন্যে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রাস অক্সাইডের অনুপাতটিও স্থির।

নাইট্রোজেনের অপর আর একটি উপকারের কথা সহসা মনে আসে না, কিন্তু তার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বাতাসে যদি নাইট্রোজেন না থাকত, সবটাই অক্সিজেন হ'ত, তা হ'লে সেই অক্সিজেনে শ্বাস-প্রশ্বাস নিলে দেহের ভিতরে রাসায়নিক ক্রিয়ার খুবই প্রাবল্য ঘটত। তার ফলে জীবন ধারণের স্বাভাবিক অবস্থা রাখা সম্ভব হ'ত না এবং শরীরের তাপমাত্রাকেও সংযত রাখা যেত না। নাইট্রোজেন থাকাতে অক্সিজেনের গাঢ়ত্ব গেছে কমে। ফলে শরীরের ভেতরের জারণ-ক্রিয়াগুলো সংযত এবং সহজ হয়েছে। পরোক্ষে এটা নাইট্রোজেনের একটা বিশেষ অবদান।

অক্সিজেন

পরিমাণের দিক দিয়ে অবশ্য অক্সিজেনের স্থান নাইট্রোজেনের পরে। কিন্তু গুরুত্বের হিসাবে বিচার করলে অক্সিজেনকেই প্রথম স্থান দিতে হবে। অক্সিজেন না থাকলে জীবজগতের অস্তিত্বই থাকত না। মানুষ, পশুপাখী, কীট-পতঙ্গ, বন-জঙ্গল, গাছ-পালা, যেখানেই প্রাণের বিকাশ সেখানেই অক্সিজেনের প্রয়োজন। সমস্ত জীবজগত অক্সিজেন-নির্ভর। শ্বাস-প্রশ্বাসেই প্রাণ স্পন্দিত, অক্সিজেন না থাকলে শ্বাস-প্রশ্বাসের অভাবে সেই প্রাণের স্পন্দন লোপ পাবে মৃত্যুর অন্ধকারে। অহোরাত্র প্রতিমুহূর্তে সমস্ত জীবজগত বাতাস থেকে অক্সিজেন টেনে নিচ্ছে। সেই অক্সিজেনের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোষের অভ্যন্তরে নানা রাসায়নিক ক্রিয়া, আর তারই ফলে পুষ্টি ও বিস্তার হচ্ছে জীবের। অক্সিজেন গ্রহণ ক'রে জীবজগত বাতাসকে ফিরিয়ে দিচ্ছে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস। অন্য সব গ্রহ, উপগ্রহে নেই অক্সিজেন, তাই সেখানে প্রাণের বিকাশও ঘটেনি।

তা ছাড়াও একটু ভাবলেই দেখা যাবে, যে কয়টি জিনিসের উপর নির্ভর ক'রে আমাদের উন্নত জীবনধারা গড়ে উঠেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আগুন। কয়লা জ্বলছে, কাঠ পুড়ছে, তেল পুড়ছে, তাই থেকে আগুন পাচ্ছি, পাচ্ছি শক্তি। কিন্তু

অক্সিজেন না থাক্‌লে কোন আগুনই পাওয়া যেত না। কাঠ, তেল, কয়লা এসব জারিত ক'রে অক্সিজেন অনলের সৃষ্টি করছে। প্রধানতঃ অনলের শক্তি দিয়েই আমাদের রান্নাঘর থেকে টাটার কারখানা পর্যন্ত সব কাজ চল্‌ছে, এই সব জ্বালানি পুড়ে আবার সেই কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসই হচ্ছে।

কথা উঠ্‌বে, এমনি ক'রে যদি অনবরত অক্সিজেন ক্ষয়ে যায় তাহ'লে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পাবেই। কিন্তু তা নয়; অক্সিজেনের অনুপাত বাতাসে স্থির রয়েছে যুগ যুগ ধরে। পৃথিবীর অতি শৈশবে আজ যে বাতাসে প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অক্সিজেন দেখছি তা ছিল না। প্রথমে মহাসাগরে যখন ছোট্ট ছোট্ট কোষের শৈবালে প্রাণের আবির্ভাব ঘটল তখনই কার্বন-ডাইঅক্সাইড থেকে তার খাদ্য উৎপাদন শুরু হ'ল আর তার বদলে বাতাসে অক্সিজেন জমতে শুরু করল। এর পরে কোটি কোটি বছর ধরে এই প্রক্রিয়া চলেছে আর একসময়ে বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে উদ্ভিদ-জগতের আর প্রাণি-জগতের একটা সমতা এসে গেল। আজ বাতাসের অক্সিজেনের পরিমাণ এত সুস্থির যে, এমনকি অক্সিজেনের অনুপাত যদি 0·107 শতাংশও কমে যায় তৎক্ষণাৎ আমরা সেটা টের পাই, আমাদের দেহযন্ত্রটি এমনি সূক্ষ্ম-অনুভূতিশীল।

বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকার কারণ হ'ল, দুইটি পরস্পর-বিরোধী কাণ্ড ঘট্‌ছে প্রকৃতিতে সব সময়। প্রাণ ধারণের জন্য যেমন অক্সিজেন বাতাস থেকে চলে যাচ্ছে, তেমনি সমস্ত উদ্ভিদ-জগৎ আবার কার্বন-ডাইঅক্সাইড শোষণ করছে। এই কার্বন-ডাইঅক্সাইড থেকে উদ্ভিদ তার কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরী করছে এবং অক্সিজেনকে ফিরিয়ে দিচ্ছে বায়ুমণ্ডলে। এমন নিপুণতার সঙ্গে প্রকৃতি এই কাজ করে যাচ্ছে যে যতটা অক্সিজেন খরচ হচ্ছে ততটাই আবার ফিরে আসছে প্রতি মুহূর্তে।
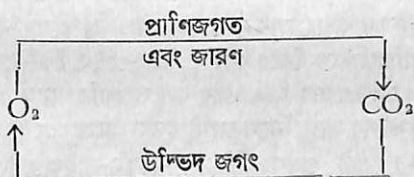
সমস্ত উদ্ভিদই কার্বন-ডাইঅক্সাইড সংহত ক'রে নিয়ে অক্সিজেন সৃষ্টি করছে। এমনকি সমুদ্রে চোখে দেখা যায় না অতি ক্ষুদ্র যে শৈবাল ফাইটো-প্লাংকটন (Phyto-plankton) রয়েছে, যার পরিমাণ অফুরন্ত, তারাও এমনি ক'রেই অক্সিজেন তৈরী করছে কার্বন-ডাইঅক্সাইড থেকে। অক্সিজেন এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইডের এই বিবর্তন-চক্রের জন্যেই প্রাণিজগৎ তথা জীবজগতের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। উদ্ভিদের পাতার কোষে সবুজ কণা ক্লোরোফিল থাকে। সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে এই ক্লোরোফিল কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলের মিলন ঘটিয়ে দেয়। ক্লোরোফিল বস্তুতঃ প্রভাবক মাত্র, এর পরিবর্তন হয় না। এই বিক্রিয়ার জন্য বেশ খানিকটা শক্তির প্রয়োজন। ক্লোরোফিল খানিকটা সৌরশক্তি শোষণ করে এই বিক্রিয়া ঘটাতে সাহায্য করে। বিক্রিয়ার

ফলে পাওয়া যায় ফরম্যালডিহাইড এবং শেষ পর্য্যন্ত গ্লুকোজ-জাতীয় শর্করা আর অক্সিজেন তার উপজাত দ্রব্য। লিখতে পারি,

$$CO_2 + H_2O \xrightarrow[\text{সূর্য্যালোক}]{\text{ক্লোরোফিল} +} HCHO + O_2$$

$$HCHO \longrightarrow C_6H_{12}O_6 \text{ (শর্করা)}$$
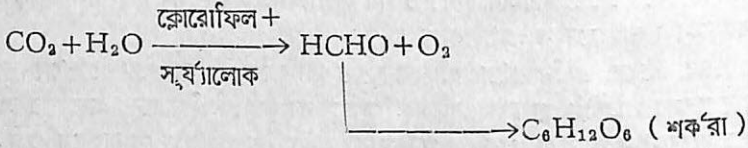
সূর্য্যালোকে ক্লোরোফিলের সাহায্যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড থেকে উদ্ভিদের এরূপ খাদ্য তৈরী করার পদ্ধতিটিকে বলে সালোকসংশ্লেষ বা Photosynthesis।

আবার প্রাণিদেহে এর বিপরীত কাণ্ড ঘটছে। কার্বোহাইড্রেট বা শর্করাজাতীয় দ্রব্য জারিত হয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড এবং জল উৎপাদন করে। মানুষের কথাই ধরা যাক। প্রশ্বাসের সময় মানুষ যে অক্সিজেন নেয়, সেটা রক্তের হেমোগ্লোবিনের সঙ্গে মিলে গিয়ে অক্সি-হেমোগ্লোবিন তৈরী হয়। এটা আবার নানারকম এনজাইম ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে কোষের ভিতরের গ্লুকোজকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড আর জলে পরিণত করে দেয়। নিশ্বাসের সঙ্গে কার্বন-ডাইঅক্সাইড বাতাসে ফিরে আসে। যদি এই কার্বন-ডাইঅক্সাইড উদ্ভিদ না নিয়ে যেত আর পরিবর্তে অক্সিজেন না দিত তবে আর আমাদের বাঁচতে হ'ত না। এই বিক্রিয়াটিকে বৈজ্ঞানিকেরা লেখেন,

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$$
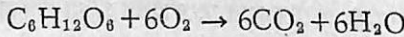
যে বাতাস আমরা গ্রহণ করি তাতে 0.03% CO_2 থাকে আর যে বাতাস ফিরিয়ে দেই তার CO_2-এর পরিমাণ 4.0%।

এ রকম করেই অক্সিজেন আর কার্বন-ডাইঅক্সাইডের বিলোপ এবং সৃষ্টির চক্রীয় পরিক্রমণ চল্‌ছে। উদ্ভিদ-জগৎ কার্বন-ডাইঅক্সাইড অপহরণ ক'রে অক্সিজেন দিচ্ছে আর সমস্ত জীবজগত অক্সিজেনকে নিয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড ফিরিয়ে দিচ্ছে। কল্পনার দৌড়টা যদি একটু খুলে দেওয়া যায়, তবে বলতে পারি, আজ এই মুহূর্ত্তে তুমি যে অক্সিজেনের অণুটি প্রশ্বাসের সঙ্গে নিলে সেটি হয়ত মুক্ত হয়েছিল দশ বছর আগে একটা প্লাংকটন থেকে। ওই প্লাংকটনটি যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড অণুটি পেয়েছিল সেটা সম্ভবতঃ অ্যাডিস-আবাবার একজন চাষীর নিশ্বাসে সৃষ্টি হয়েছিল আরও পঁচিশ বছর আগে। কিংবা তারও আগে সেই কার্বন-ডাইঅক্সাইড অণুটি জন্ম নিয়েছিল রাণী ভিক্টোরিয়া বা বাহাদুর শাহের নিশ্বাসে।

প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়াও আমরা নানা দরকারে ও শিল্পে বাতাসের অক্সিজেনকে কাজে লাগাই। সালফারকে বাতাসের অক্সিজেনে পুড়িয়ে আমরা সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরী করি; সালফিউরিক অ্যাসিড বর্ত্তমান উন্নত জীবনযাত্রার প্রয়োজনে নানারকম শিল্পের প্রধান এবং আদি উপকরণ। আবার, বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে পাই অ্যামোনিয়া, পূর্ব্বেই দেখেছি। এই অ্যামোনিয়াকে বাতাসের অক্সিজেন দিয়ে জারিত ক'রে তৈরী হয় নাইট্রিক অ্যাসিড। এটিও আধুনিক নানা শিল্পে ও বিস্ফোরক তৈরী করতে একান্ত প্রয়োজন। এমনি আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

কার্বন-ডাইঅক্সাইড

বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ খুবই কম, 0.03%। দশ হাজার লিটার বাতাসে মাত্র তিন লিটার কার্বন-ডাইঅক্সাইড থাকে। পরিমাণে সামান্য হলেও এর অবদান যে অসামান্য তা' আগেই দেখেছি। কার্বন-ডাইঅক্সাইড না হ'লে উদ্ভিদজগত লোপ পাবে আর তার সঙ্গে প্রাণিজগতও। বাতাসে যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড আছে সেটা সহজেই প্রমাণ করা যায়। একটু স্বচ্ছ পরিষ্কার চুনের জল বাতাসে রেখে দিলে সেটা খানিকক্ষণ পরে ঘোলাটে হয়ে যায়। বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইড আছে বলেই এরকম হয়, চুনের জলকে ঘোলাটে করা ওর ধর্ম। আমাদের নিশ্বাসের ফলে যে গ্যাস বাইরে আসে সেটাকেও চুনের জলের ভিতর পরিচালনা করলে চুনের জল ঘোলাটে হয়। সুতরাং নিশ্বাস-বায়ুতে কার্বন-ডাইঅক্সাইড আছে।

কার্বন-ডাইঅক্সাইডের যে পরিমাণটা উল্লেখ করা হ'ল সেটা গড় হিসেবের। মাটির কাছের বাতাসে গড়ে এই পরিমাণ কার্বন-ডাইঅক্সাইড দেখা যায়। কয়েক মাইল উপরে উঠে গেলে এর অনুপাত অনেকটা কমে যায়।

সালোকসংশ্লেষণে কার্বন-ডাইঅক্সাইড প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ-জগতে প্রবেশ করে এবং জৈব পদার্থে পরিণত হয়—এ বিষয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে। সাধারণতঃ মনে হ'তে পারে জমির উপরে, বন জঙ্গল যেখানে বেশী, যেমন গ্রীষ্মমণ্ডলের বনাঞ্চলে, সেখানেই সালোকসংশ্লেষণ বেশী হবে। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে মহাসাগরের উপরেই এই প্রক্রিয়ার অত্যধিক প্রাচুর্য্য। সমুদ্র-শৈবালের পরিমাণ যেমন বেশী, আলোর বর্তমানে কার্বন-ডাইঅক্সাইড শোষণও তেমনি দ্রুত। সংখ্যা দিয়ে পরিমাণটা প্রকাশ করলে আরও সহজে বোঝা যাবে।

সারাবছরে সালোক-সংশ্লেষে শোষিত কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ

সমুদ্রপৃষ্ঠে	=	462×10^{15} গ্রাম
জমির উপরে	=	73×10^{15} গ্রাম
পৃথিবী পৃষ্ঠে মোট	=	535×10^{15} গ্রাম

উদ্ভিদের কার্বন-ডাইঅক্সাইড শোষণ ছাড়াও প্রকৃতিতে আর একটি ব্যাপারে বাতাসের এই উপাদানটি অংশ গ্রহণ করে। এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন হ্যারল্ড ক্লেটন উরে (H. C. Urey, 1952), যিনি ভারী হাইড্রোজেন বের ক'রে যশস্বী হয়েছেন। কঠিন ভূত্বকের ওপরে রয়েছে প্রচুর সিলিকেট-জাতীয় শিলা, বিশেষ ক'রে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট। এগুলো জলে একেবারেই দ্রবীভূত হয় না। বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইড এদের আক্রমণ ক'রে কার্বনেটে পরিণত ক'রে দেয়। বিজ্ঞানীরা সংকেত দিয়ে লেখেন,

$$CaSiO_3 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + SiO_2$$
$$MgSiO_3 + CO_2 \rightarrow MgCO_3 + SiO_2$$

এই পরিবর্তন জলস্রোতের সান্নিধ্যে খুবই ত্বরান্বিত হয়ে থাকে। কার্বনেটগুলি অনুকূল অবস্থা পেলে বাইকার্বনেট হ'য়ে জলে দ্রবীভূতও হ'য়ে যায়। এই প্রাকৃতিক

ক্রিয়াকে আজকাল "উরে বিক্রিয়া" বলে উল্লেখ করা হয়। ভূত্বকের রাসায়নিক পরিবর্তনে ও শিলাক্ষয়ে আর ভূমির উর্ব্বরতা সৃষ্টিতে এই বিক্রিয়ার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

সমুদ্রে অনেক ছোট বড় জলচর প্রাণী রয়েছে যাদের দেহ একটা শক্ত খোলা দিয়ে ঢাকা। এই বহিরাবরণ ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে প্রধানতঃ তৈরী। ধ্বংসের পরে এই সব খোলা গিয়ে সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত হয় এবং চুনাপাথরের শিলাস্তরে পরিণত হয়। ক্যালসিয়াম কার্বনেট কিন্তু সৃষ্টি হয় বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইড থেকেই। অর্থাৎ সামুদ্রিক প্রাণীও বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইড পরোক্ষ ভাবে ব্যবহার করছে।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইড প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে অপসারিত হয়ঃ (১) উদ্ভিদ-জগতের সালোকসংশ্লেষে (২) উরে প্রক্রিয়ায় সিলিকেট শিলার দ্বারা (৩) চুনাপাথরের স্তরে।

অপর দিকে বিভিন্ন উপায়ে বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রথমতঃ সমস্ত জীবজগতে নিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিক্ষণে কার্বন-ডাইঅক্সাইড উৎসারিত হচ্ছে একথা আগেই বলা হয়েছে। জীবজন্তুর, গাছপালার ধ্বংসের ফলেও কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে ফিরে আসছে। দ্বিতীয়তঃ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে নানা গলিত লাভার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস ধরিত্রীর অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে বায়ুতে এসে যায়। তৃতীয়তঃ, নানা রকমের জ্বালানি সর্ব্বদা পুড়ছে ; তেল, পেট্রোল, কয়লা, কাঠ, বাড়ীতে, ফ্যাক্টরীতে, কল-কারখানায়, রেলে, মোটর-কারে সর্ব্বদা পোড়ান
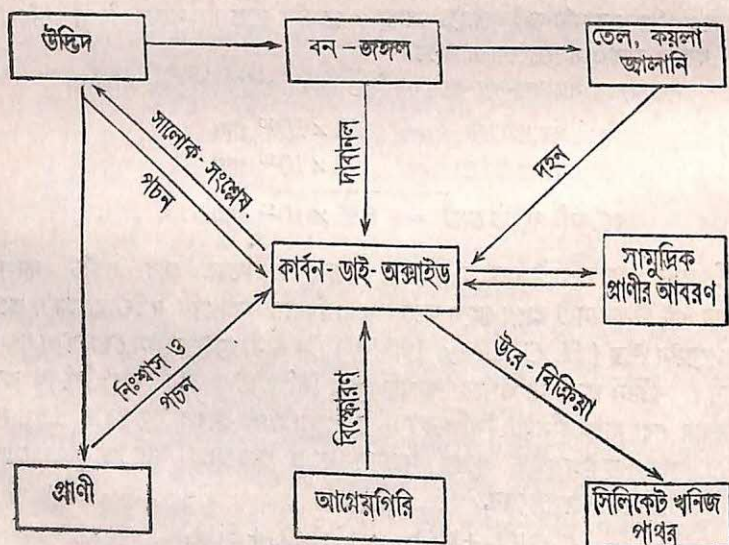
চিত্র ১৪। বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইডের উৎপাদন ও অপসারণ

হচ্ছে। তাছাড়া, পাহাড়ে-জঙ্গলে মাঝে মাঝে বিরাট সব দাবানল জ্বলছে—এ সবই প্রচুর কার্বন-ডাইঅক্সাইড উৎপাদন করছে। একটা আনুমানিক হিসেবে দেখা যায় (Kalle,

1945) প্রতি বছরে কেবলমাত্র এই জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড আসছে 6×10^{15} গ্রাম ; নেহাৎ কম নয়।

কার্বন-ডাইঅক্সাইডের অপসারণ এবং উদ্ভবের ভিতর সামঞ্জস্য থাকার জন্যেই বাতাসে ওর পরিমাণ মোটামুটি নির্দিষ্ট। গত একশ বছর ধরে মাটির উপরের বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইড সযত্নে মেপে দেখা গেছে, এ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের অনুপাত প্রায় 0·0026% বেড়ে গেছে। পরিমাণগুলো দেখা যাক,

সময়	কার্বন-ডাইঅক্সাইডের অনুপাত (%)
1901—1910	0·0293
1911—1920	0·0298
1921—1930	0·0303
1931—1940	0·0310
1941—1950	0·0316

কেন কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে তার সদুত্তর দেওয়া কঠিন। অনেকেই মনে করেন, এই শতাব্দীর দ্রুত কলকারখানার প্রসার আর বনজঙ্গলের আবাদী জমিতে পরিণত হওয়াই এই বৃদ্ধির কারণ।

তাপ, আলো, অতি-বেগুনী রশ্মি, রঞ্জন-রশ্মি এগুলো সবই তরঙ্গ-শক্তি। এই বিভিন্ন তরঙ্গের গতির বেগ একই, পার্থক্য শুধু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বা তাদের কম্পন-সংখ্যার। তাপের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব বড়, আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য তার চেয়ে কম। লাল আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নীল আলোর চেয়ে বেশী। অতি-বেগুনী রশ্মি, রঞ্জন-রশ্মি এদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনেক কম। পদার্থের ভিতর দিয়ে যখন এ সব তরঙ্গ যায়, তখন পদার্থ সব রকমের তরঙ্গ শোষণ ক'রে নিতে পারে না। প্রত্যেকটি পদার্থের কতকগুলি স্ব স্ব নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ধরে রাখার ক্ষমতা আছে। সূর্য্য থেকে যে সব রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়, সেই আলোকরশ্মি কার্বন-ডাইঅক্সাইড হজম করতে পারে না। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভিতর দিয়ে সেগুলো অনায়াসে চলে আসে। অথচ রাত্রিতে পৃথিবী ঠাণ্ডা হওয়ার সময় যে তাপ বিকীর্ণ হ'তে থাকে সেই তাপের বেশ খানিকটা কিন্তু কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ধরে রাখে। এর ফলে পৃথিবী তার সবটা তাপশক্তি হারায় না। এটা কার্বন-ডাইঅক্সাইডের এক অযাচিত করুণা বলতে হবে।

আণবিক ঘড়ি

বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইড বিজ্ঞানীদের আর একটা অভিনব ব্যাপারে সহায়তা করেছে। এর সাহায্যে আজ অতি পুরানো জৈব পদার্থ বা হাজার হাজার বছরের পুরানো জীবাশ্ম, যেগুলো মাটির নীচে প্রস্তরীভূত হয়ে রয়েছে তাদের বয়স নির্ভুলভাবে স্থির করা সম্ভব হয়েছে। এর কৃতিত্ব মুখ্যতঃ বৈজ্ঞানিক লিব্বির (Libby)।

মহাশূন্যের কোন অজ্ঞাত উৎস থেকে সর্বদা মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic rays) পৃথিবীতে আসছে। এই রশ্মি যখন বায়ুর উপরের স্তরে এসে আঘাত করে তখন

বহু নিউট্রন-কণার উদ্ভব হয়। যখন এই নিউট্রনের কোন একটি এসে নাইট্রোজেনের কোন পরমাণুকে ধাক্কা দেয়, তখন তার কেন্দ্র থেকে একটা প্রোটন বেরিয়ে যায় আর নাইট্রোজেন পরমাণুটি কার্বন পরমাণুতে [$^{14}_{6}C$] পরিণত হয়। পরমাণু-বিজ্ঞানীরা সংকেত দিয়ে এটা প্রকাশ করেন,

$$^{14}_{7}N + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{14}_{6}C + ^{1}_{1}p$$
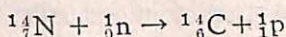
এই নাইট্রোজেন-উদ্ভূত কার্বনের পরমাণুটি সবদিক দিয়েই সাধারণ কার্বনের মতো, কিন্তু তেজস্ক্রিয়। এই তেজস্ক্রিয় কার্বন আস্তে আস্তে ভেঙ্গে যায় এবং ইলেকট্রন বিকিরণ ক'রে আবার পূর্বের নাইট্রোজেনে ফিরে যায় ঃ

$$^{14}_{6}C \rightarrow ^{14}_{7}N + {}_{-1}^{0}e$$
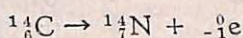
অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পরমাণুর মতো এই তেজস্ক্রিয় কার্বনও একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে ভাঙতে থাকে।

সাধারণ কার্বনের পরমাণুতে থাকে ছয়টি প্রোটন আর ছয়টি নিউট্রন। কিন্তু এই তেজস্ক্রিয় কার্বনের পরমাণুতে থাকে ছয়টি প্রোটন আর আটটি নিউট্রন। প্রোটন-সংখ্যা এক হলেই রাসায়নিক বিচারে পরমাণুদের অভিন্ন মনে করা যায় ; তাদের সমস্ত রাসায়নিক ধর্ম একই হবে। এদের বলে 'আইসোটোপ'। এই তেজস্ক্রিয় কার্বন, উপরের বায়ুস্তরে যার সৃষ্টি, সেগুলো অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। এই কার্বন-ডাইঅক্সাইড অবশ্যই তেজস্ক্রিয় ; কিন্তু অপর যে কোন ধর্মে সাধারণ কার্বন-ডাইঅক্সাইডের মতোই ব্যবহার করে। তেজস্ক্রিয়তা মাপার জন্যে খুবই সূক্ষ্ম যন্ত্র আজকাল তৈরী হয়েছে। তাই দিয়ে বাতাসের মধ্যে সাধারণ কার্বন-ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে কি অনুপাতে তেজস্ক্রিয় কার্বন-ডাইঅক্সাইড মিশে আছে তা মাপা গেছে। দেখা গেছে, প্রতি লক্ষ কোটি কার্বন-ডাইঅক্সাইড অণুর মধ্যে একটি মাত্র তেজস্ক্রিয় কার্বন-ডাইঅক্সাইড অণু আছে। যে সামান্য তেজস্ক্রিয়তা মাটির কাছের বাতাসে দেখা যায় তা এই কার্বন-ডাইঅক্সাইডের জন্যেই। গত লক্ষ বছরে বাতাসে তেজস্ক্রিয় কার্বন-ডাইঅক্সাইডের এই অনুপাতের কোন ব্যতিক্রম হয়নি, একথা মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইডের সবগুলো অণু একরকম নয়, তার সামান্য কয়েকটি তেজস্ক্রিয়। পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদই কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্রহণ ক'রে জৈব পদার্থের সৃজন করে। সুতরাং উদ্ভিদ-জগতে যে সব জৈব পদার্থ অর্থাৎ কার্বন-ঘটিত পদার্থ থাকবে তার মধ্যে সেই উপরের অনুপাতেই তেজস্ক্রিয় ($^{14}_{6}C$) কার্বন-ঘটিত অণুও থাকবে। আর আগে পরে যে সময়েই হোক, প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর দেহেও তা প্রবেশ করবে। এই তেজস্ক্রিয় ($^{14}_{6}C$) কার্বন যে অবস্থায় যেখানেই থাকুক, মন্থর গতিতে তা ভাঙ্তে থাক্বে। দেখা গেছে $^{14}_{6}C$-কার্বন আইসোটোপের তেজস্ক্রিয়তা 5568 বছরে অর্ধেকটা হ্রাস পায়।

অঙ্ক দিয়ে যদি বুঝতে চাই, তা হ'লে যে সূত্র অনুসারে সময়ের সঙ্গে তেজস্ক্রিয়তা হ্রাস পায়, সেটা জানতে হবে। সূত্রটি হ'ল,

$$t = \frac{2 \cdot 303}{\lambda} \log (I_0/I) \approx 18490 \log (I_0/I)\ ; \quad (\lambda = 0 \cdot 639/5568)$$

I_0 এবং I যথাক্রমে আদি তেজস্ক্রিয়তা এবং t বছর পরের তেজস্ক্রিয়তা। কোন একটি পুরাতন জৈবজাত বস্তু বা কোন জীবাশ্মের বয়স স্থির করতে হ'লে সেই নমুনাটির বর্তমান তেজস্ক্রিয়তা (I) মাপতে হবে। আর সদ্যোজাত উদ্ভিদ পরীক্ষা করে তার তেজস্ক্রিয়তা (I_0) নির্ণয় করতে হবে। I এবং I_0 মাপা হ'ল, এখন উপরের সমীকরণ দিয়ে নমুনাটির বয়স (t) নির্ধারণ করা যাবে। এই উপায়ে 25000 বছরের পুরানো নমুনার বয়সও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। বাতাসের এই $^{14}_{6}C$-সমন্বিত কার্বন-ডাইঅক্সাইডকে "আণবিক ঘড়ি" মনে করা যেতে পারে।

কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাসকে আজকাল নানা কাজে লাগান হয়, যেমন সোডা তৈরী করতে, শুকনো বরফ তৈরী করতে। কিন্তু তার জন্যে চুনাপাথর পুড়িয়েই সেই গ্যাস তৈরী করা হয়, বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

মিথেন আর কার্বন-মনোক্সাইড

কার্বন-উদ্ভূত আরও দু'টি গ্যাস বাতাসে রয়েছে, যদিও অতি সামান্য পরিমাণে ; এরা হচ্ছে মিথেন আর কার্বন-মনোক্সাইড। এদের পরিমাণ ঃ মিথেন=0·0001% আর কার্বন-মনোক্সাইড=0.00001%। পুকুর বা ডোবার পচা পানা থেকে বাতাসে মিথেন গ্যাস আসে ; মাটিতে পড়ে থেকে স্যাঁতসেতে জমিতে লতাপাতা যখন পচতে থাকে তখনও এই গ্যাস সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া, জীবজন্তুর আন্ত্রিক গ্যাসের সঙ্গেও প্রচুর মিথেন গ্যাস উৎসারিত হয়। শুধু শেষের উপায়েই প্রায় পাঁচ কোটি টন মিথেন বছরে বাতাসে আসে। আর কার্বন-মনোক্সাইডের উৎস হচ্ছে ইঞ্জিনের কয়লা বা তেল। এই জ্বালানি পুড়বার সময় কার্বন-মনোক্সাইড খানিকটা হয়ই। বছরে গড়ে প্রায় বিশ কোটি টন কার্বন-মনোক্সাইড এভাবে বায়ুতে প্রবেশ করে। এই দু'টি গ্যাসেরই অপসরণ ঘটে মাটির উপরে রয়েছে এমনি কয়েকটি ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে। তাই বাতাসে এদের পরিমাণ বাড়তে পারে না।

নিষ্ক্রিয় গ্যাস ঃ হিলিয়াম, আরগন ইত্যাদি

বাতাসে পাঁচটি গ্যাস আছে স্বল্প-পরিমাণে, যাদের কোন রকম রাসায়নিক সক্রিয়তা আদৌ দেখা যায় না। এজন্য এদের নাম দেওয়া হয়েছে—"নিষ্ক্রিয় গ্যাস"। এই পাঁচটি গ্যাস হচ্ছে—হিলিয়াম, নিয়ন, আরগন, ক্রিপটন এবং জিনন। এদের মধ্যে আরগনের পরিমাণ তবু একটু বেশী আর অপরগুলি অত্যন্তই কম। এই কারণেই এদের আর একটি নাম হচ্ছে "বিরল গ্যাস"। বাতাসে জিননের পরিমাণ হচ্ছে এক কোটি ভাগে এক ভাগের চেয়েও কম। আর এরা নিষ্ক্রিয় বলে এদের অস্তিত্ব ধরাও বেশ শক্ত। কিছুদিন আগেও নিষ্ক্রিয় গ্যাস যে রয়েছে বাতাসে, তা জানা ছিল না। এদের আবিষ্কারের পেছনে একটু ইতিহাস আছে। লর্ড র‍্যালে (Lord Rayleigh,

1887) এক সময়ে গ্যাসের ঘনত্ব নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তিনি বাতাস থেকে নাইট্রোজেন পৃথক ক'রে নিয়েছিলেন, আবার, শোরা এবং অন্যান্য রাসায়নিক থেকেও নাইট্রোজেন তৈরী ক'রে নিয়েছিলেন। নাইট্রোজেনের ঘনত্ব যখন নির্ণয় করলেন তখন দেখতে পেলেন যে বাতাসের নাইট্রোজেনের ঘনত্ব অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ থেকে পাওয়া নাইট্রোজেনের ঘনত্বের চেয়ে সামান্য বেশী। প্রতি ঘন-সেণ্টিমিটারে নাইট্রোজেনের ঘনত্ব দেখা গেল :

ঘনত্ব

বাতাসের $N_2 \rightarrow$ 0·0012572 গ্রাম

বিভিন্ন রাসায়নিক থেকে উদ্ভূত $N_2 \rightarrow$ 0·0012506 গ্রাম

পার্থক্যটুকু অতি সামান্য, তবু বারে বারে একই ফল পাওয়াতে সিদ্ধান্ত করতে হ'ল, যে বাতাসের নাইট্রোজেনের সঙ্গে আরও কোন অপেক্ষাকৃত ভারী গ্যাস মিশে আছে। এরপরে র‍্যালে এবং স্যার উইলিয়াম র‍্যামজে মিলে সেই ভারী গ্যাসের সন্ধান শুরু করলেন। খুব উত্তপ্ত কপার এবং তারপর উত্তপ্ত ম্যাগনেসিয়ামের উপর দিয়ে ক্রমাগত বাতাসকে পরিচালিত করে বাতাসের সব অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন শোষণ করিয়ে নেওয়ার পর দেখা গেল, যে একটুখানি গ্যাস থেকে গেছে। এই গ্যাসটুকুকে কিছুতেই শুষে নেওয়া যায় না, আর এটা একেবারেই নিষ্ক্রিয়। কোন রকম বিক্রিয়াতে এই গ্যাসের উৎসাহ নেই বলে এর নাম দেওয়া হল "অলস" বা আরগন (1894)। পরে আরও সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণে এর মধ্যে আরও চারটি গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেল। আজকাল অবশ্য বাতাসকে খুব ঠাণ্ডা করে অতিরিক্ত চাপ দিয়ে তরল করে নেওয়া হয়। যখন নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন তরল হয়ে যায় তখনও আরগন গ্যাস অবস্থায় থাকে এবং সেটা সহজেই আলাদা করে নেওয়া হয়। এই আরগন ইলেকট্রিক বাল্‌বে বর্তমানে প্রচুর ব্যবহার হয়। আজকাল প্রচার বিজ্ঞপ্তিতে আর সাইনবোর্ডে যে লাল্‌চে টিউব ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে থাকে আর একটি বিরল গ্যাস, নিয়ন। এই নিয়নও বাতাস থেকেই পৃথক করে নেওয়া হয়।

বাতাসে যে হিলিয়াম গ্যাস আছে সেটা পৃথিবীর ভিতরের তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলির বিভাজনের ফল, একথা প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে। অনেক তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুগুলি ভেঙে যাবার সময় পরাবিদ্যুৎযুক্ত আল্‌ফা-কণা (α-particles) বেরিয়ে আসে। পরে এই কণাগুলি ইলেকট্রন গ্রহণ করে, তখন ওদের বিদ্যুৎভার প্রশমিত হয়ে যায় এবং সেগুলি হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হয়।

পেট্রোলিয়াম কূপগুলি থেকে যে প্রাকৃতিক গ্যাস সর্ব্বদা বেরিয়ে আস্‌ছে, তার মধ্যে বেশ কিছুটা হিলিয়াম মিশ্রিত থাকে। যুগ যুগ ধরে ভূত্বকে বা অভ্যন্তরে তেজস্ক্রিয়া চল্‌ছে এবং আজও অব্যাহত রয়েছে এবং হিলিয়ামের সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং মনে হতে পারে সময়ের সঙ্গে হিলিয়ামের পরিমাণটা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কিন্তু বাতাসে হিলিয়ামের পরিমাণ সামান্য এবং স্থির। তাহ'লে কোন না কোন উপায়ে বাতাস থেকে হিলিয়াম অপসারিত হচ্ছে। হিলিয়াম নিষ্ক্রিয়, সুতরাং কোন রাসায়নিক উপায়ে হ্রাস পেতে পারে না। হিলিয়াম খুব হাল্‌কা, হাইড্রোজেন ছাড়া

এর চেয়ে লঘুতর কোন পদার্থ নেই। খুব উপরের বায়ুস্তরে উষ্ণতা খুব বেশী এবং যে সামান্য বাতাসটুকু সেখানে রয়েছে সেটা আবার টগ্‌বগ্‌ করে ফোয়ারার মত সর্ব্বদা আলোড়িত হচ্ছে। হিলিয়াম হাল্‌কা বলে সহজেই উপরের স্তরে পেঁছে যায় এবং উষ্ণতা বেশী বলে এই হাল্‌কা হিলিয়াম অণুগুলির গতিবেগও হয় খুব বেশী। এর যে সকল অণুর বেগ প্রতি সেকেণ্ডে 11 কিলোমিটারের বেশী হয় সেগুলো পৃথিবীর আকর্ষণ প্রতিহত ক'রে শূন্যের দিকে ছুটে বেরিয়ে যায়। এমনি করেই হিলিয়াম বায়ুস্তর থেকে অপসারিত হচ্ছে। বর্তমানে যে হারে হিলিয়াম বাতাসে আসছে সেই হারেই উপরের স্তর থেকে সেটা পালিয়ে যাচ্ছে, তাই এর পরিমাণটা স্থির হয়ে রয়েছে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন উপরের স্তরে গিয়ে হিলিয়ামের এই প্রতি সেকেন্ডে এগারো কিলোমিটার গতিবেগ পেতে হ'লে সেখানকার উষ্ণতা অন্ততঃ 1500°K হবে।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং রাশিয়াতে এখন প্রচুর হিলিয়াম তৈরী করা হয়, প্রধানতঃ প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে পৃথক ক'রে। উড়োজাহাজে এর ব্যবহারের কথা অবশ্য সবারই জানা।

বাতাসে সামান্য একটু হাইড্রোজেনও আছে। সূর্য্য থেকে যে অতি-বেগুনী আলো পৃথিবীর কাছে এসে পেঁছয় তার সংস্পর্শে জলীয় বাষ্পের বিশ্লেষণ হয় এবং হাইড্রোজেন তৈরী হয়। হিলিয়ামের মত এই হাইড্রোজেনও হাল্‌কা বলে বায়ুস্তরের উপরের দিকে চলে যায় এবং সেখান থেকে মহাশূন্যে অপসারিত হয়। পরে আমরা দেখব, বায়ুমণ্ডলের উপরের অংশে অনেক বিদ্যুৎযুক্ত কণার বা আয়নের সমাবেশ আছে। বায়ুমণ্ডলের এই স্তরটিকে বলে আয়নোস্ফিয়ার, এবং তাতে হাইড্রোজেনের আয়ন বা প্রোটন আছে যথেষ্ট। এই প্রোটনগুলি হাইড্রোজেন থেকেই আয়নিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে।

ওজোন

বাতাসে আর একটি গ্যাস অল্প পরিমাণে আছে, তার নাম ওজোন (ozone)। পূর্ব্বে যে উপাদানগুলির তালিকা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে একে ধরা হয় নি, তার কারণ মাটির কাছের বাতাসে অর্থাৎ ট্রোপোস্ফিয়ারে এর অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই হয়। মাটি থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার বা কুড়ি মাইল উপরের এক সঙ্কীর্ণ বায়ুস্তরে খানিকটা ওজোন রয়েছে। তার পরিমাণ হবে লক্ষ ভাগ বাতাসে এক থেকে দুই ভাগ। তারও অনেকটা উপরে উঠে গেলে আরও খুব সামান্য ওজোনের অস্তিত্ব দেখা যায়। বায়ুর যে স্তরটাতে ওজোনের পরিমাণ বেশী তাকে ওজোন স্তর বা ওজোনোস্ফিয়ার (ozonosphere) বলে উল্লেখ করা হয়। যদিও অনেক উঁচুতে রয়েছে এবং পরিমাণেও কম তবুও পৃথিবীর কাছে এর প্রয়োজনীয়তা একান্ত অপরিহার্য্য ; সে কথায় পরে আসছি।

কি উপায়ে উঁচুস্তরের বাতাসে ওজোন এল তার একটা উত্তর পাওয়া গেছে। সূর্য্য থেকে আলো, তাপ ইত্যাদি নানারকম শক্তি-তরঙ্গের সঙ্গে অতি-বেগুনী রশ্মিও পৃথিবীর দিকে আসছে। এই অতি-বেগুনী রশ্মির মধ্যে যাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 2400A°-এরও

[$1A^\circ = 10^{-8}$ সেন্টিমিটার] কম, সেগুলো অক্সিজেন অণুকে ভেঙে পরমাণুতে পরিণত করে দেয়। এই জায়মান অক্সিজেন পরমাণু অপর আর একটি অক্সিজেন অণুর সঙ্গে মিলে সৃষ্টি করে ওজোনের। ওজোন বস্তুতঃ অক্সিজেনেরই আর একটি রূপভেদ ; তিনটি অক্সিজেন পরমাণু একত্র মিলে ওজোনের অণু (O_3), আর দুইটি পরমাণু মিলে সাধারণ অক্সিজেনের অণু (O_2)। ওজোনের সক্রিয়তা এবং অন্যান্য ধর্মের প্রাবল্য সাধারণ অক্সিজেনের চেয়ে অনেক বেশী। রসায়নবিদরা সঙ্কেতের সাহায্যে এ রকম পরিবর্তনকে প্রকাশ করেন ঃ

(ক) $O_2 + h\nu \rightarrow O + O$ [$h\nu$ হচ্ছে আলোকশক্তির
$O + O_2 \rightarrow O_3$ (ওজোন) কোয়াণ্টাম।]
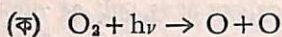
আবার 2500 A°-এর চেয়ে বেশী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অতি-বেগুনী রশ্মি কিন্তু ওজোনকে ভেঙে দেয় এবং অক্সিজেন অণু ও পরমাণু সৃষ্টি করে। অক্সিজেন পরমাণু যদি ওজোনের সংস্পর্শে অধিকক্ষণ থাকে তাহ'লেও ওজোন ভেঙে অক্সিজেন তৈরী হয়।

(খ) $O_3 + h\nu \rightarrow O_2 + O$
$O_3 + O \rightarrow O_2 + O_2$
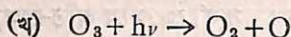
দেখা যাচ্ছে (ক) প্রক্রিয়াতে ওজোন তৈরী হচ্ছে, আর (খ) প্রক্রিয়াতে ওজোন লয় পাচ্ছে। এই বিপরীত প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা সাম্যাবস্থা আছে, যার ফলে সামান্য কিছু ওজোন সর্বদা বাতাসে থেকে যায়।

উপরের বায়ুস্তরে সর্বদাই আবার প্রচণ্ড সব বজ্রপাত আর বিদ্যুৎক্ষরণ চলছে ; তার জন্যেও অক্সিজেন থেকে কিছু ওজোন তৈরী হয়।

বাতাস স্থির থাকে না, বায়ুপ্রবাহ চলছেই। উপর থেকে ওজোনপুষ্ট বাতাস ত' নীচের দিকেও আসে। সুতরাং খানিকটা ওজোন ট্রোপোস্ফিয়ারে প্রবেশ করে। কিন্তু ধূলিকণা আর বিশেষ করে গাছপালার সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওজোন খুব দ্রুত বিনষ্ট হয়ে অক্সিজেনে পরিণত হয়। এই জন্য মাটির খুব কাছাকাছি কয়েক মিটারের মধ্যে ওজোনের কোন চিহ্ন থাকে না।

সৌরকিরণের সঙ্গে প্রচুর অতি-বেগুনী রশ্মি থাকে। 3000A°-এর কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সমস্ত অতি-বেগুনী রশ্মির অধিকাংশ ওজোনই শোষণ করে নেয়। সেই রশ্মির সামান্য একটুখানি আমাদের কাছে এসে পেঁছুতে পারে। তা না হলে সবটা অতি-বেগুনী কিরণ যদি পৃথিবীর বুকে এসে পেঁছুত তবে শুধু যে অতিরিক্ত ওজোনের জন্য শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হ'ত তাই নয়, ঐ রশ্মির তীব্রদাহে জীবজগতের বেঁচে থাকাই দুষ্কর হত। সেই মারাত্মক অবস্থা থেকে ওজোনের স্তরই আমাদের রক্ষা করেছে। 30-40 কিলোমিটারের উপরে খানিকটা স্তরে যে তাপমাত্রা বেড়ে যায় সেটা ওই ওজোনের অতি-বেগুনী রশ্মি শোষণের ফলে। অপর দিকে ধরিত্রী থেকে যে তাপরশ্মি বিচ্ছুরিত হয় তারও খানিকটা ওজোন গ্রহণ করে 90000A°-এর কাছাকাছি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে। এর

ফলে কিছুটা তাপ বায়ুমণ্ডলে থেকে যায়। ওজোনের এরূপ শোষণের বিষয়টি চিত্র ১৪ থেকে বোঝা যাবে।
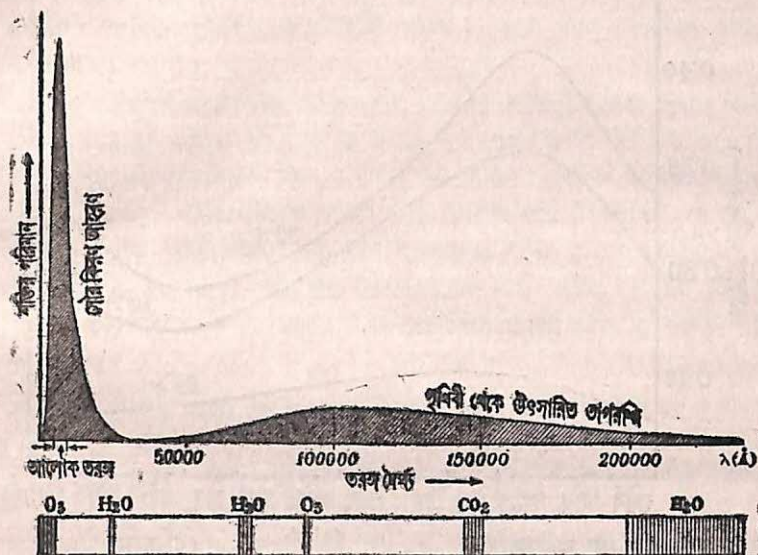
চিত্র ১৪। সৌরকিরণের আহরণ এবং পৃথিবী থেকে উৎসারিত তাপরশ্মি

ওজোন সম্বন্ধে আর একটা বিষয় জানা গেছে। অক্ষাংশের সঙ্গে ওজোনের পরিমাণ অনেকটা পরিবর্তিত হয়। কলকাতার উপরের বায়ুস্তরে যে পরিমাণ ওজোন রয়েছে লণ্ডনের উপরের বায়ুস্তরে তার চেয়ে বেশী ওজোন আছে। তা ছাড়া, কোন জায়গার ওজোনের পরিমাণটা আবার বছরের ঋতুর সঙ্গেও বদলায়, বিশেষ করে নিরক্ষ-রেখা থেকে দূরের অক্ষাংশে এটা বেশী লক্ষ্য করা গেছে। 1957-58 সনে IGY-এ (ইন্টারন্যাশনাল জিয়োফিজিক্যাল ইয়ারে) পৃথিবীব্যাপী যে নানা অনুসন্ধান চালান হয়েছিল তা থেকে এ বিষয়েও অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। বছরের বিভিন্ন সময়ে ওজোনের পরিমাণ কিভাবে বদলাতে থাকে তার ধারণা ১৫নং চিত্র থেকে সহজে পাওয়া যাবে। নিরক্ষরেখার কাছে ওজোনের পরিমাণ কম এবং মোটামুটি সমানই থাকে। কিন্তু উত্তর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ওজোনের পরিমাণও অধিক এবং সেটা গরমের সময় খুব বেড়ে যায় এবং শীতের সময় যথেষ্ট কমে যায়।

এখানে ওজোনের পরিমাণকে সেন্টিমিটারে দেওয়া হয়েছে। কোন জায়গার উপরে মোট যতটা ওজোন রয়েছে তার সবটুকু একত্র সংবদ্ধ ক'রে যদি পৃথিবীর ওপরে প্রমাণ চাপ এবং প্রমাণ তাপমাত্রায় (1 atm, 0°C) রাখা যেত তাহ'লে সেটা যত সেন্টিমিটার পুরু হ'ত তাই ওজোনের পরিমাণ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

এখন আরও প্রমাণ পাওয়া গেছে, যে ওজোনের পরিমাণ এবং বিস্তারের উপরে
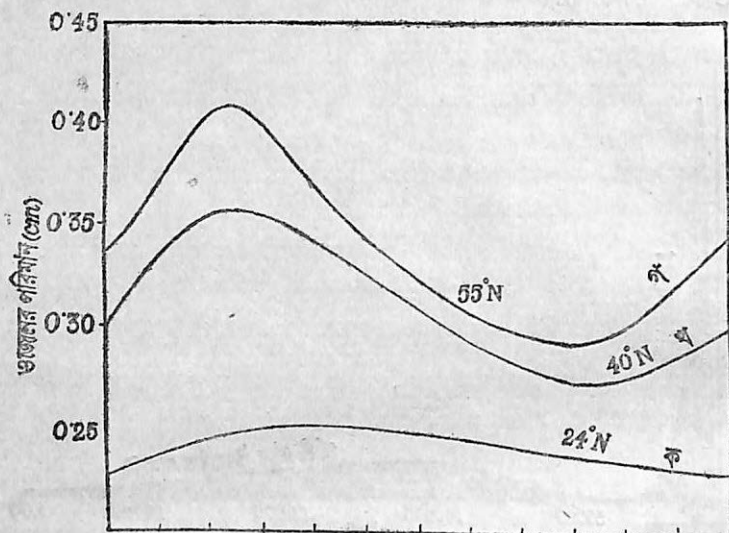
চিত্র ১৫। বছরের বিভিন্ন সময়ে অক্ষাংশের সঙ্গে ওজোনের পরিমাণের পরিবর্তন

পৃথিবীর আবহাওয়া অনেকটা নির্ভর করে। কিন্তু কেন বা কিভাবে এটা ঘটে তা খুব ভাল করে আজও বোঝা যায়নি, এ বিষয়ে বহু পরীক্ষা চলছে এখন।

বাতাসের ধূলিকণা

গ্যাস ছাড়াও বাতাসে রয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট কঠিন বস্তুকণা বা ধূলিকণা। ধূলোর এই কণাগুলি খুব ছোট, এত ছোট যে খালি চোখে দেখাই যায় না। আর অনায়াসে এগুলি বাতাসে ভেসে থাকতে পারে, যদিও এদের ঘনত্ব যথেষ্ট বেশী। একটা তুলনা করা যেতে পারে। নদীর ঘোলা জল নিয়ে একটা কাচের গ্লাসে রেখে দিলে মাটির ভারী কণাগুলি নীচে থিতিয়ে পড়ে। কিন্তু বেশ কয়েকদিন এভাবে রেখে দিলেও সেই জল একেবারে স্বচ্ছ হয় না, সামান্য ঘোলাটে অস্বচ্ছতা থেকেই যায়। এর কারণ, যে কণিকাগুলি খুব সূক্ষ্ম সেগুলি জলের অণুর ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করে, থিতিয়ে যেতে পারে না। কোন একটা বস্তু যদি অন্য কোন মাধ্যমে এমনি অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় প্রলম্বিত হ'য়ে থাকে বিজ্ঞানীরা তাকে বলেন, "কলয়েড"। বাতাসে অতিসূক্ষ্ম ধূলিকণাগুলি ভেসে আছে গ্যাসের মধ্যে, এটাকেও কলয়েড অবস্থা বলা যেতে পারে।

বাতাসে ধূলোর এ রকম ছোট ছোট কণার অবস্থিতি কিন্তু সহজেই দেখান সম্ভব। এজন্য সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঘরে একটি খুব ছোট ছিদ্র দিয়ে সূর্য্যের আলো প্রবেশ করানো

হয়। দিনের বেলায় কুড়েঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিলে সরু সরু রন্ধ্র দিয়ে এরকম সূর্যকিরণ ভিতরে যায়। সেই অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে আলোর দিকে তাকালে একটি উজ্জ্বল রশ্মিপথ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই আলোকরশ্মির মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে অসংখ্য ধূলিকণা ছুটোছুটি করছে। একে বলে "টিণ্ডেল প্রভাব" (Tyndall effect)।

সব জায়গায় ধূলিকণার সংখ্যা সমান নয়। গণনায় মোটামুটি দেখা গেছে ভারত মহাসাগরের উপরের বাতাসে প্রতিলিটারে ধূলিকণার সংখ্যা হবে 436000, আর সেই সংখ্যাটা আটলান্টিক মহাসাগরের উপরে হ'চ্ছে 1830000। জমির উপরের বায়ুস্তরে স্বভাবতই ধূলিকণার পরিমাণ অনেক বেশী হবে, বিশেষ করে কলকারখানা বা বড় বড় শহরাঞ্চলে। গড়ে প্রতিলিটারে এখানকার ধূলিকণার সংখ্যা প্রায় 40,00,000। এ সত্ত্বেও বাতাস ত' মোটামুটি স্বচ্ছ. তাহ'লে কণাগুলো কত সূক্ষ্ম সহজেই অনুমান করা যায়। বলা বাহুল্য, মাটি থেকে যত উপরের দিকে যাওয়া যাবে, ধূলিকণার সংখ্যা কম্‌তে থাকবে।

পৃথিবীর মাটিতে পাথর, শিলা, বালু সব ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়, তাদের সূক্ষ্ম কণাগুলো ওড়ে আকাশে। কল-কারখানার লক্ষ লক্ষ চিমনি থেকে আসে নানারকমের ছোট ছোট কণার ছাই আর ধূলো। আগ্নেয়গিরি থেকেও প্রচুর ধূলো গিয়ে বায়ুস্তরে উপস্থিত হয়। সিগারেটের ধোঁয়া থেকেই কি কম ছাই বাতাসে যায়।

প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ উল্কা ছুটে আসে পৃথিবীর দিকে। বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটো-স্ফিয়ারে এসে ঘর্ষণের ফলে সেগুলো জ্বলে ছাই হয়ে যায়। এই উল্কা-ভস্ম থেকেও প্রচুর পরিমাণ ধূলিকণা বাতাসে আসে। ধূলিকণা ছাড়াও বাতাসে ভেসে থাকে সূক্ষ্ম আরও অন্যান্য জিনিস। ফুলের পরাগ এদের অন্যতম। সূক্ষ্ম পরাগরেণু বাতাসে ভেসে ভেসে কয়েক শত মাইল পর্য্যন্তও চলে যায়। আবার বাতাসে নানা ধরণের জীবাণু, ব্যাক্টিরিয়া, ঈস্ট, ইত্যাদি রয়েছে অসংখ্য। ওদের কতকগুলো আমাদের উপকারে আসে। আবার অনেক রোগের জীবাণুকে বাতাসই বয়ে নিয়ে অন্যত্র ছড়িয়ে দেয়।

বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ভাসমান ধূলিকণাগুলিও এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যায়। এমনও দেখা গেছে, প্রচণ্ড আঁধিতে আফ্রিকার সাহারা মরুর হাজার হাজার টন বালুকণা উড়ে গেছে আর সেগুলো গিয়ে পড়েছে বারশ' মাইল দূরে আটলান্টিকের বুকে জাহাজের উপরে। 1883 সনে সুমাত্রার কাছে ক্রাকাতোয়া দ্বীপে এ যুগের আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ডতম বিস্ফোরণ ঘটেছিল। বিস্ফোরণে দ্বীপটির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গিয়েছে। এত অপর্য্যাপ্ত ধূলোয় চারদিক এমন করে ঢেকে গিয়েছিল যে সেই দ্বীপ থেকে একশ মাইল দূরেও দিনরাত্রির কোন ভেদ বোঝা যেত না। বিস্ফোরণে যে বিশাল ধূলিকণার স্তূপ উপরের দিকে উঠেছিল তার খানিকটা ত্রিশ কিলোমিটার উঁচুর বায়ুস্তর পর্য্যন্ত গিয়েছিল। সেখানকার বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে এই বিরাট ধূলো প্রায় তের দিন ধরে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছে, তার পরে ধীরে ধীরে থিতিয়ে পড়েছে মাটিতে। এই

ধূলিকণার সামান্য কিছুটা প্রায় দুই বছর পর্য্যন্ত বায়ুতে ছিল। এই ধুলোর প্রদক্ষিণ কালে নানা রকমের অদ্ভুত সূর্য্যোদয় আর সূর্য্যাস্ত দেখা যেত। এই ধুলোতে আলোর বিচ্ছুরণের জন্যে কখনও সূর্য্যকে নীল, চাঁদকে সবুজ রংয়ের বলে মনে হ'ত।

বায়ুজগতের ধুলোর এই মালিন্যটুকুর কিন্তু প্রয়োজন রয়েছে। মাথার উপরে নীল আকাশ সীমাহীন বিস্তৃত। এই আকাশের বুকে সারাক্ষণ চল্‌ছে কত অপরূপ বৈচিত্র্য আর বর্ণাঢ্য আলোর খেলা। সূর্য্যোদয়ে রক্তিম জটাজাল, সূর্য্যাস্তে বেলা শেষের হালকা মেঘ-ছাওয়া আবীর মাখা আকাশ, সন্ধ্যায় মায়াভরা গোধূলির মোহময় আলো—বর্ণ-বৈচিত্র্যের এই মেলা দেখি আমরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে। বৈশাখের আকাশে তাপসের গৈরিক উত্তরীয়, শ্রাবণের অশ্রুপ্লুত বসুন্ধরার উপরের আকাশে সজল সিক্ত বসন, আশ্বিনের আনন্দোজ্জ্বল আকাশের নীল শাড়ীতে রূপালী চুম্‌কী, পৌষের বিষণ্ণ নীরব আকাশের শ্বেত বসন, ফাল্গুনের লাস্যময়ী আকাশের নীলাঞ্চল—তুলনা নেই এই সমারোহের—আশ্চর্য্য, সুন্দর। উপরের আকাশ এত সুন্দর, তাই বসুন্ধরাও এমনি সুন্দর, সেই জন্যেই পৃথিবীকে এত ভালবাসি।

একথা সহসা মনে আসেনা যে মহাশূন্যের এই বর্ণচ্ছটার মূলে কিন্তু রয়েছে বাতাসেরই অসংখ্য ধূলিকণা। "আকাশবীণার রবিরশ্মিতন্ত্রীগুলি" থেকে আলোর তরঙ্গ এসে পড়ে ধূলিকণার উপরে। ধূলিকণার সঙ্গে এই সংঘাতের ফলে সেই আলো বিচ্ছুরিত ও প্রতিসরিত হ'য়ে নানা বর্ণের তরঙ্গের মূর্চ্ছনায় ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। সৃষ্টি হয় নানা রঙের আলোকের। এই বিচ্ছুরিত আলোর মধ্যে নীলাভ আলোরশ্মির প্রাধান্যই বেশী, তাই আকাশ নীল। বাতাসে যদি ধূলিকণা না থাকত, সূর্য্যালোকের এই বিচ্ছুরণ যদি না হ'ত তা হ'লে দিনের আকাশও হ'ত গভীর অন্ধকার। আর দিনের বেলাতেও সেই অন্ধকার আকাশে রাতের মত সংখ্যাতীত নক্ষত্র মিট্‌মিট্‌ করছে দেখা যেত। আকাশে থাকত না কোন বর্ণ-বৈচিত্র্যের লীলা, হ'ত না ক্ষণে ক্ষণে সৌন্দর্য্যের বিভিন্ন প্রকাশ। সে পৃথিবী হ'ত নিতান্তই একঘেয়ে। নগণ্য ধুলোর সূক্ষ্মকণাই দিয়েছে পৃথিবীকে তার অনুপম সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্য।

ধূলিকণার আর এক অবদান রয়েছে মেঘ থেকে বৃষ্টির রূপায়ণে। মেঘের বাষ্প প্রথমে এই ধূলিকণাকে কেন্দ্র ক'রেই ছোট্ট ছোট্ট জলবিন্দুতে পরিণত হয়। তার পর আস্তে আস্তে এই জলবিন্দুগুলির উপর আরও বাষ্প ঘন হ'য়ে জমে আর বিন্দুগুলি বড় ও ভারী হ'য়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট বড় হ'লে বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে এসে মাটিতে পড়ে। ধরণী হ'য়ে ওঠে শস্যশ্যামলা। ধূলিকণা না থাকলে বাষ্প থেকে জলকণা হওয়া দুঃসাধ্য হ'ত এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা যেত কমে। বনানীলাঞ্ছিত ধরিত্রীর রূপ যেত বদ্‌লে।

বাতাসে ভাসমান কঠিন বস্তুকণার মধ্যে কিন্তু অতি সূক্ষ্ম সব তুষারকণা বা বরফের কুচিও রয়েছে। জলীয় বাষ্পের ঘনীভবন থেকেই এগুলো মেঘের মধ্যে তৈরী হচ্ছে। এ ছাড়াও রয়েছে লবণের খুব ছোট্ট ছোট্ট কণা। সমুদ্র থেকে জল যখন বাষ্পীভূত হয়ে আসে তার সঙ্গে সামান্য লবণও বাতাসে চলে আসে এবং অনেক উপরেও

চলে যায় আর বাতাসে ভাসতে থাকে অতিসূক্ষ্ম কণা হ'য়ে। জলীয় বাষ্পের জলবিন্দুতে পরিণত হওয়ার সময় এই কণাগুলো কেন্দ্র হিসেবে খুবই সাহায্য করে।

দেহ-পরিচিতি :

সবটা বায়ুমণ্ডল ঠিক একরকম নয়। এর আগেই আমরা দেখেছি যতই উপরের দিকে যাওয়া যায়, বাতাসের ঘনত্ব ততই কমে আসে। এ ছাড়াও বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন অংশের আচরণ, তাপমাত্রার পরিবর্তন, গতি-চাঞ্চল্য প্রভৃতি আলাদা। পরীক্ষা ক'রে ক'রে দেখা গেছে, বায়ুমণ্ডলে রয়েছে মোটামুটি চারটি বিভিন্ন স্তর। বিশেষ করে তাপমাত্রা বিচার করেই বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য স্তরগুলির আরও কোন কোন বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ঠিক মাটির সঙ্গেই বাতাসের যে স্তরটি রয়েছে, তাকে বলা হয় ট্রোপোস্ফিয়ার (Troposphere)। মাটি থেকে উপরের দিকে প্রায় ষোল কিলোমিটার পর্য্যন্ত ট্রোপোস্ফিয়ারের সীমানা। অবশ্য সর্বত্র এটা সমান পুরু নয়। বিষুব-রেখা অঞ্চলে ট্রোপোস্ফিয়ার প্রায় ষোল কিলোমিটার (দশ মাইল) গভীর, আবার মেরু-অঞ্চলে এর গভীরতা মোটামুটি ছয় থেকে আট কিলোমিটার মাত্র। ট্রোপোস্ফিয়ারের প্রধান বিশেষত্ব হল, যত উপরের দিকে যাওয়া যাবে উষ্ণতা তত কমতে থাকবে। কলকাতার উষ্ণতা গড়ে 20°C আর কলকাতার উপরের ট্রোপোস্ফিয়ারের শেষ সীমানায় তাপমাত্রা প্রায় মাইনাস্ পঞ্চান্ন ডিগ্রি (−55°C)।

ট্রোপোস্ফিয়ারের ঠিক উপরেই বায়ুর দ্বিতীয় স্তর স্ট্রাটোস্ফিয়ার (Stratosphere)। এই স্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরটির গভীরতা প্রায় 50～60 কিলোমিটার। কিন্তু স্ট্রাটোস্ফিয়ারের তাপমাত্রা সর্বত্র প্রায় একরকম এবং তাপমাত্রাটা বেশ নীচু, মোটামুটি −55°～−65°C। কেবল ষ্ট্রাটোস্ফিয়ারের মাঝখানে 35～40 কিলোমিটার উচ্চতায় খানিক অংশে তাপমাত্রাটা একটু বেশী। তার কারণ, এখানে সূর্য্যের অতি-বেগুনী আলোকরশ্মির শোষণ হ'তে থাকে আর ওজোন তৈরী হয়। রশ্মির শোষণের ফলে এখানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ওজোনের স্তর অবশ্য তীব্র রশ্মির দাহ থেকে আমাদের রক্ষা করছে, তাই জীবজগত রক্ষা পাচ্ছে। একথা আগেই বলা হয়েছে। তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন হয় না বলে স্ট্রাটোস্ফিয়ারের অপর নাম, "সমতাপ-মণ্ডল"। আর ট্রোপোস্ফারকে বলে "পরিবর্তী-মণ্ডল"। কিন্তু ট্রোপোস্ফিয়ার এবং স্ট্রাটোস্ফিয়ার নামেই এই স্তর দুইটি নানাদেশে সুপরিচিত ; সুতরাং সেই নামই এখানে ব্যবহার করা হবে। কেউ কেউ ট্রোপোস্ফিয়ারকে ক্ষুব্ধস্তর আর স্ট্রাটোস্ফিয়ারকে শান্তস্তর বলেন।

স্ট্রাটোস্ফিয়ার ছাড়িয়ে গেলেই দেখা পাওয়া যায় আয়নোস্ফিয়ারের বা আয়ন-মণ্ডলের (Ionosphere)। বাতাস এখানে খুব হাল্কা বটে তবে অত্যন্ত প্রখর সৌরকিরণের জন্যে সেই বাতাসটুকু আয়নিত হয়ে থাকে। অসংখ্য বিদ্যুৎযুক্ত কণায়—আয়ন আর ইলেকট্রনে—পরিপূর্ণ এই অঞ্চল। তার ফলে এই স্তরটি যেমন বিদ্যুৎবাহী তেমনই এখানে প্রচণ্ড শক্তিশালী তড়িৎ-ক্ষেত্রের উদ্ভব হয়েছে। 70-80 কিলোমিটার উচ্চতা থেকে শুরু করে প্রায় 800 কিলোমিটার উচ্চতা পর্য্যন্ত এই আয়নোস্ফিয়ার স্তর পরিব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছে (চিত্র ১৬)।

আয়নোস্ফিয়ারের পরেও যে সামান্য বাতাস রয়েছে সেটাকে বলে বহিঃস্তর বা এক্সোস্ফিয়ার (Exosphere)। কোথায় এর সমাপ্তি হয়েছে বলা শক্ত ; মহাজাগতিক শূন্যের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে বলে ধরা হয়।

বিজ্ঞানীরা এভাবে বায়ুমন্ডলকে মোট চারটি স্তরে ভাগ করে দেখছেন। উচ্চতার হিসাবে এই স্তরগুলির বিস্তৃতি এবং তাপমাত্রা মোটামুটি ঃ—

স্তর	উপরের দিকে বিস্তৃতি (কিলোমিটার)	তাপমাত্রা (°C)
১। ট্রোপোস্ফিয়ার	0~16	+55°C~−55°C
২। স্ট্রাটোস্ফিয়ার	16~80	−55°C~−70°C
৩। আয়নোস্ফিয়ার	80~800	উচ্চ উষ্ণতা
৪। এক্সোস্ফিয়ার	800~মহাশূন্য	—

এই স্তরগুলোর সীমারেখা অবশ্য একেবারে স্থির বা নির্দিষ্ট নয়। স্থান বা সময়ের সঙ্গে কিছু কিছু পরিবর্তন নিশ্চয়ই হয়। যেমন গ্রীষ্মকালে ট্রোপোস্ফিয়ারের গভীরতা শীতকালের চেয়ে খানিকটা বেশী। একটি স্তর অপর স্তরে কিছু অনুপ্রবেশ করেই। উপরে যে বিস্তৃতির সীমা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা একটা মোটামুটি পরিমাণ মাত্র।

ট্রোপোস্ফিয়ার এবং স্ট্রাটোস্ফিয়ারের মাঝখানের সংযোগ-সীমাকে বলে ট্রোপো-পজ (Tropopause)। 2-3 কিলোমিটার পুরু এই খুব ঠান্ডা ট্রোপো-পজ স্তরটি ট্রোপোস্ফিয়ারের ঊর্ধ্বসীমা নির্দেশ করছে। স্ট্রাটোস্ফিয়ারের শেষ সীমানাতেও তেমনি রয়েছে আর একটি খুব শীতল সীমারেখা, স্ট্রাটো-পজ (Stratopause)।

বায়ুর বিভিন্ন স্তরের সন্ধানের ইতিহাসও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। প্রারম্ভেই ডঃ উইলসনের নাম করা উচিত হবে। তিনিই বোধ হয় সর্বপ্রথম (1749) ঘুড়ির সঙ্গে থার্মোমিটার বেঁধে দিয়ে উপরের বায়ুস্তরে পাঠিয়ে দেন। এমনি করে তিনি ট্রোপোস্ফিয়ারের বেশ খানিকটা উচ্চতার তাপমাত্রা জানতে পেরেছিলেন এবং উচ্চতার সঙ্গে যে বাতাসের উষ্ণতা কমে যায় সেটা তাঁর পরীক্ষা থেকেই বোঝা গিয়েছিল। এরপর এল বেলুনের যুগ। ছোট বড় নানা ধরনের বেলুনের সঙ্গে থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার প্রভৃতি পরিমাপক-যন্ত্র জুড়ে দিয়ে উপরের বায়ুস্তরের তথ্য আহরণ হ'তে লাগল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে আরম্ভ হ'ল উপরের স্তরে মানুষের অভিযান। খুব বড় বড় বেলুনের সঙ্গে বেশ বড়সড় বাক্স বা গ্লোব লাগিয়ে দেওয়া হ'ল। এদের বলা হয় বেলুনের গন্ডোলা। এই গন্ডোলাতে অভিযাত্রীরা যেতেন আর তাঁদের সঙ্গে থাকত নানা পরিমাপক যন্ত্রপাতি। বেলুন-অভিযাত্রীরা বিভিন্ন স্তরের তাপমাত্রা, চাপ, বৈদ্যুতিক অবস্থা, অক্সিজেনের পরিমাণ ইত্যাদি অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। এ সকল অভিযান অবশ্য খুবই বিপদসঙ্কুল ছিল, কিন্তু সেই বিপদের সম্ভাবনা মানুষের দুর্জ্ঞেয়কে জানার ঐকান্তিক বাসনাকে প্রতিহত ক'রতে পারে নি।

যতদূর মনে হয়, বেলুন নিয়ে গত শতাব্দীতে সবচেয়ে উঁচুতে উঠেছিলেন গ্ল্যাসিয়ার এবং তাঁর সহকর্মী কক্সওয়েল। এঁদের গন্ডোলা অন্ততঃ 30,000 হাজার

ফিটেরও উপরে উঠেছিল। 1862-66'র মধ্যে এঁরা পঁচিশবারেরও বেশী এরকম অভিযান চালিয়েছিলেন। এঁরা যে সমস্ত তথ্য এনেছিলেন পরবর্তীকালের আবহতত্ত্বের গবেষণায় সেগুলো খুবই সাহায্য করেছে।

আবার এ সময়ে ফরাসী বিজ্ঞানী লিওঁ তিসারে দা বোর্ট (Leon Tisserence de Bort) কয়েকবছর ধরে অভিযাত্রী-হীন বহু বেলুন নানা যন্ত্রযুক্ত করে উপরে পাঠাতে থাকেন। এ থেকে জানা গেল, প্রায় 7-8 মাইল উপরে চলে গেলে বাতাসের উষ্ণতার আর বেশী পরিবর্তন দেখা যায় না; তাপমাত্রা প্রায় সমান থাকে। এভাবেই স্ট্রাটো-স্ফিয়ারের অস্তিত্ব জানা গেল। এত উঁচুতে বায়ুস্তর যেমন ঠাণ্ডা তেমনি হাল্কা। প্রথমে তাই মনে হয়েছিল সেখানে আর বেলুন নিয়ে মানুষের যাওয়া চলবে না। কিন্তু সে বাধাও অপসারিত হ'ল।

এ শতাব্দীর প্রথম এবং সার্থক বেলুন-অভিযান করেন ডঃ বারসন এবং তাঁর সহযোগী সুরিঙ্গ [Dr. A. Berson ও R. J. Süring]। এঁদের গণ্ডোলা প্রায় 36000 ফিট উঠেছিল এবং ওঁরা সেখানে তাপমাত্রা দেখেছিলেন -54°C।

এই সময়ে আর একটি বিস্ময়কর ঘটনা মানুষের গোচরে এল। দেখা গেল এক রকম রশ্মি দিনরাত অনবরত বহির্বিশ্ব থেকে পৃথিবীতে এসে পড়ছে। এ রশ্মি যেমন জোরালো তেমনি অন্তর্ভেদী, সব কিছুর ভিতর দিয়ে অনায়াসে অপ্রতিহত অবস্থায় চলে যাচ্ছে। চারদিক থেকে অনবরত এই রশ্মিপ্রবাহ আসছে। এখন অবশ্য আমরা জানি এগুলো মহাজাগতিক রশ্মি। তখন কিন্তু মনে করা হয়েছিল, এর উৎস উপরের বায়ুস্তরের কোথাও। সেটা অনুসন্ধান করতে প্রথম অগ্রণী হলেন ডঃ পিকার্ড। তাঁর প্রথম স্ট্রাটোস্ফিয়ার অভিযানে সঙ্গী ছিলেন ডঃ ফাইফার। 1931-এর মে মাসে জার্মেনীর অক্সবুর্গ থেকে এঁরা উড়েছিলেন। এক বিশালাকার বেলুনের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম পাতের তৈরী গোলাকার একটা গণ্ডোলাতে এঁরা যাত্রা করেন; বেলুনটির ব্যাস ছিল প্রায় 100 ফিট আর ঘনায়তন ছিল 494000 কিউবিক ফিট। গণ্ডোলাটি চারদিকে সম্পূর্ণ বন্ধ ক'রে নিয়েছিলেন, পর্যবেক্ষণের জন্য শুধু কয়েকটি পুরু কাচের জানালা রাখা ছিল। গণ্ডোলার ব্যাস ছিল সাত ফিট। সঙ্গে অবশ্য সিলিণ্ডারে করে প্রচুর অক্সিজেন নিতে হয়েছিল। এঁরা 51775 ফিট, প্রায় দশ মাইল উঁচু পর্য্যন্ত উঠতে পেরেছিলেন। এই অভিযানে পিকার্ড সৌভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যান। উপরে গিয়ে তারা দেখতে পান বেলুনের দড়িগুলো জট পাকিয়ে গেছে। দড়ি টেনে নীচে নামার কোন আশা নেই। সূর্য্যের তাপে গণ্ডোলা ভীষণ তেতে উঠ্‌ল। জট ছাড়াতে গিয়ে পিকার্ড দড়ি ছিঁড়ে ফেললেন। অসহ্য তাপে সারাদিন বন্দী থাকার পর, সূর্য্যাস্তের পর যখন গ্যাস ঠান্ডা হ'য়ে ঘন হ'ল তখন ধীরে ধীরে মৃতপ্রায় অবস্থায় নীচে এসে পেঁছিলেন। তার পরের বছরে ডঃ ম্যাক্স কসিনসকে নিয়ে তিনি আরও একটু বেশী উচুতে গিয়েছিলেন 54789 ফিট অবধি। এঁদের অভিযানে স্ট্রাটো-স্ফিয়ারের অস্তিত্বের প্রমাণ ত' পাওয়া গেলই, তাছাড়া এই স্তরের নীচের অংশের নানা বৈজ্ঞানিক তথ্যও সংগৃহীত করা গেল।

কিন্তু বেলুনের গন্ডোলা ক'রে আরও উঁচুতে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন একদল রুশ

বৈজ্ঞানিক [P. F. Fedoseyenko, A. B. Vassenko এবং I. Usiskyn, 1934]। বিখ্যাত 'অসোয়াভিয়াখিম' বেলুনের সঙ্গে গণ্ডোলায় করে এঁরা 72000 ফিটের উপরে উঠেছিলেন। কিন্তু ফিরে আসার সময় বেলুন থেকে গন্ডোলাটি ছিঁড়ে গিয়ে মাটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে যায় এবং অভিযাত্রীরা প্রাণ হারান। 1935-এর নভেম্বরে "এক্সপ্লোরার 2" (Explorer II) বেলুন নিয়ে এক আমেরিকান দল [Kepner, Stevens and Anderson] 74000 ফিট পর্য্যন্ত ছুঁয়ে এসেছিলেন। ঝড়ে পড়ে এঁদের গণ্ডোলাও ভেঙে যায়, তবে অভিযাত্রীরা প্যারাসুট দিয়ে নেমে আসতে পেরেছিলেন। এমনি করে মানুষ বেলুন নিয়েই স্ট্রাটোস্ফিয়ারের অনেকটা অধিকার করে ফেলেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই। যুদ্ধোত্তর যুগে আরও অনেক বেলুন অভিযান হয়েছে। 1961-তে কমাণ্ডার রস এবং প্র্যাথার 113740 ফিট উপরে উঠতে পেরেছিলেন।

এখানে মাত্র কয়েকটি অভিযানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যাত্রীবিহীন
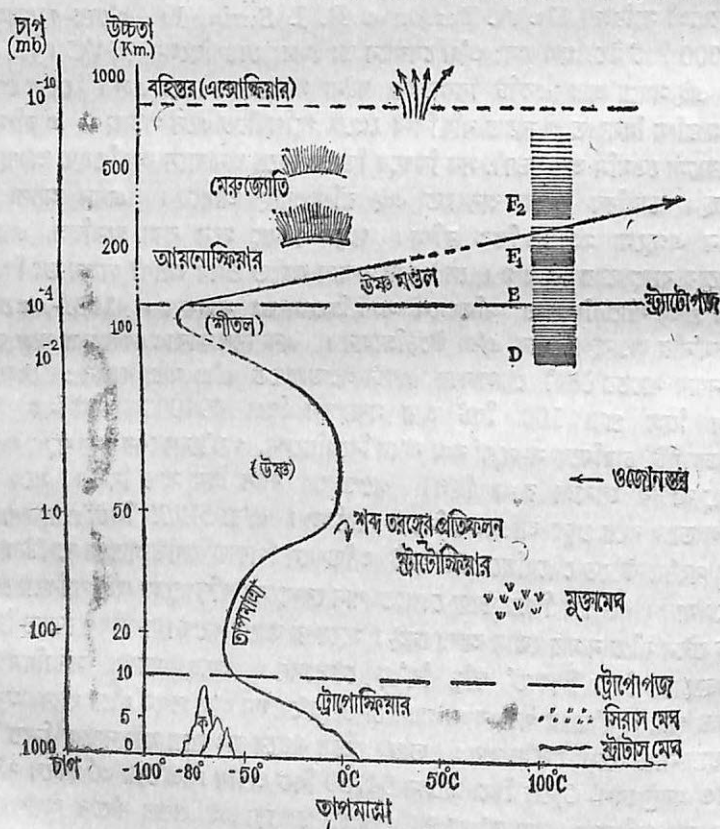
চিত্র ১৬। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর

অসংখ্য বেলুনের অভিযান এবং অভিযাত্রী নিয়ে আরও অনেক পরীক্ষা এ শতাব্দীতে

হয়েছে ; তার ফলে নানা তথ্য জানা গিয়েছে। এর পরেই এরোপ্লেন আর রকেটের যুগ এসে গেল। স্ট্রাটোস্ফিয়ারের উপযোগী জেট প্লেন নিয়ে এই মণ্ডলের সম্পূর্ণ তথ্য এখন আমাদের জানা হ'য়ে গেছে। রকেট দিয়ে আরও উপরের আয়নোস্ফিয়ারের সংবাদও এখন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে। আজকের চন্দ্র অভিযানের যুগে খুব উচ্চস্তরের সব তথ্যই রকেট মারফত সংগ্রহ করা হচ্ছে। তবু অপেক্ষাকৃত নীচের স্তরগুলোর (20 মাইল পর্য্যন্ত) কোন কোন প্রয়োজনীয় সংবাদের জন্য আজও আধুনিক প্লাস্টিকের তৈয়ারী বেলুনের ব্যবহার রয়েছে। রকেট বা বেলুনের থেকে আজকাল রেডিয়ো বা টেলিমিটার সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে অতিসহজে তথ্যগুলি পাওয়া যায়। স্বতঃ-নির্দেশক যন্ত্রও কখন কখন রকেটে দেওয়া হয়। রকেটগুলোর যান্ত্রিক ব্যবস্থা এ রকম যে ফিরে আসার সময় সেগুলো খুলে গিয়ে এমন আকার নেয় যাতে গতি যায় কমে এবং মাটিতে এসে পড়লে ভেঙ্গে যায় না। আধুনিক রকেট যথেষ্ট ভার নিয়ে অনেক উঁচুতে যেতে পারে এবং অক্ষত ফিরে আসতে পারে। Viking (M-7) চারশ' পাউণ্ড নিয়ে প্রায় 135 মাইল পর্য্যন্ত উঁচুতে যায় ; Skylark রকেট দেড়শ' পাউণ্ড নিয়ে একশ মাইল উচ্চতায় উড়তে পারে। এসব সত্ত্বেও বেশী উঁচু স্তরের তথ্য সংগ্রহ করা খুব সহজ নয়। কারণ উপরের বাতাসের ঘনত্ব খুবই কম এবং ঐ উচ্চতায় রকেটের স্থিতিকাল স্বল্প, তথ্য সংগ্রহ বড় জোর পাঁচ মিনিট। তাছাড়া রকেটের নিজের উৎসারিত গ্যাসের জন্যে সংগৃহীত তথ্য নির্ভুল নাও হ'তে পারে।

ট্রোপোস্ফিয়ার ও স্ট্রাটোস্ফিয়ার

আগেই বলেছি, ভূপৃষ্ঠের সংলগ্ন বায়ুস্তরটি হচ্ছে ট্রোপোস্ফিয়ার আর সেটা প্রায় ষোল কিলোমিটার পুরু। সম্পূর্ণ বায়ুমণ্ডলের প্রায় 80 শতাংশই রয়েছে এই বায়ুস্তরের মধ্যে। তাই এখানকার বাতাস সবচেয়ে ঘন। মাটি থেকে যত উঁচুতে যাওয়া যাবে ঘনত্ব আসবে কমে, সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রাও। এই ট্রোপোস্ফিয়ারেই রয়েছে জলীয় বাষ্প আর নানা রকমের মেঘ। বাতাসের উদ্দামতা, ঝড়-জল, বজ্রপাত আর বৃষ্টি এ সবের সৃষ্টি এই স্তরে। পৃথিবীর আবহাওয়ার সব কিছু প্রক্রিয়াই এই ট্রোপোস্ফিয়ারে সীমাবদ্ধ। ট্রোপোস্ফিয়ার বায়ুমণ্ডলের অন্দর-মহল। এর উপরের স্তরগুলিতে জলীয় বাষ্প বা মেঘ নেই বললেই চলে। কিন্তু ওজোন গ্যাসের পরিমাণ ট্রোপোস্ফিয়ারে অতি সামান্য। অপর দিকে ধূলিকণার প্রাচুর্য্য সর্ব্বাধিক এই স্তরেই।

ট্রোপোস্ফিয়ারের ঊর্ধ্বসীমা হচ্ছে ট্রোপো-পজ বা শান্তমণ্ডল। সেখানে উষ্ণতা নেমে গেছে $-50°C$-এরও নীচে। এর পরেই প্রায় ষাট কিলোমিটার উপরের দিকে বিস্তৃত রয়েছে স্ট্রাটোস্ফিয়ার। এখানে মেঘ নেই, নেই ঝড় বৃষ্টি, বাতাসের ঘনত্বও বেশ কম। বায়ু প্রবাহ রয়েছে কিন্তু তার মধ্যে আথালি-পাথালি ঘূর্ণী নেই। সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই স্তরের নীচের অংশের তাপমাত্রা স্থির। আর সেই তাপমাত্রাটা $-50° \sim -55°C$। পৃথিবী থেকে প্রায় $40 \sim 45$ কিলোমিটার উপরে একটু অংশে আবার তাপমাত্রা বাড়তে থাকে আর উষ্ণতা উঠতে উঠতে প্রায় $0°C$-এ এসে পেঁছয়। এর পর আবার যতই উপরে উঠব

তাপমাত্রা দ্রুত কমে যাবে এবং স্ট্রাটোস্ফিয়ারের শেষ সীমায় এসে উষ্ণতা প্রায় $-40°C$-এ নেমে যায় (চিত্র ১৬)। আগেই বলা হয়েছে স্ট্রাটোস্ফিয়ারে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার উচ্চতায় অক্সিজেন অতি-বেগুনী রশ্মি প্রচুর পরিমাণে শোষণ করে নেয় সৌরকিরণ থেকে, তাই উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। উৎপন্ন ওজোনও অনেকটা সৌররশ্মি শোষণ করে। একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, অক্সিজেন ত' সর্বত্রই রয়েছে, তবে শুধু স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ওজোন হ'ল কেন। ওজোন বেশী তাপমাত্রায় টিকতে পারে না, ভেঙে যায়। তাই ট্রোপোস্ফিয়ারে যদি কোন ওজোন তৈরীও হয় তবে সঙ্গে সঙ্গেই সেটা বিনষ্ট হয়ে যায়। স্ট্রাটোস্ফিয়ারের তাপমাত্রা অনেক কম বলে সেখানে ওজোন অনেকটা স্থায়িত্ব লাভ করে।

স্ট্রাটোস্ফিয়ারের বাতাস হাল্কা, মেঘমুক্ত সুতরাং সহজে এবং অপেক্ষাকৃত কম শক্তি ব্যয়েই উড়োজাহাজ এখানে দূর পাল্লায় ছুটতে পারে। ঝড়ঝঞ্ঝার বিপদ নেই। এই কারণেই বিশেষ করে স্ট্রাটোস্ফিয়ার সম্পর্কে গবেষণা ও খোঁজ খবরের খুব গুরুত্ব। যুদ্ধের প্রয়োজনে এবং দ্রুত পাড়ি দেওয়ার জন্য স্ট্রাটোস্ফিয়ারে চলাচল এখন অপরিহার্য্য।

কোন কোন সময়ে অনেক উঁচুতে খুব উজ্জ্বল নানা রঙের ছোট ছোট মেঘের টুকরো দেখা যায়। এগুলো দিনের বেলার প্রখর আলোতে দেখা সম্ভব নয়। সূর্যাস্তের পরে অথবা সূর্যোদয়ের আগে নির্মল আকাশে এদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা রয়েছে স্ট্রাটোস্ফিয়ারের নীচের অংশে 20~25 কিলোমিটার উচ্চতায়। ছোট ছোট ব'লে এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল ব'লে এদের নাম দেওয়া হয়েছে, "মুক্তা মেঘ" (mother of pearl clouds)। ঠিক নিশ্চিত করে বলা যায় না, তবে বর্ণবৈচিত্র্যের জন্য অনেকেই মনে করেন এগুলো তুষারের স্তূপ। বায়ুপ্রবাহের জন্য খানিকটা আর্দ্র বাতাস কখনও ট্রোপো-পজ অতিক্রম করে স্ট্রাটোস্ফিয়ারের অনুপ্রবেশ করা সম্ভব। সেখানকার অতিশীতল উষ্ণতায় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে তুষারস্তূপে পরিণতি লাভ করে। সেখানে আট্‌কে থাকা তুষারের স্তূপই মুক্তা-মেঘ।

আরও অনেক উঁচুতে 80 কিলোমিটারেরও উপরে এক রকম অতি পাত্‌লা মেঘ মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। সেগুল খুব হাল্‌কা কিন্তু অত্যন্ত উজ্জ্বল—মনে হয় সেখান থেকে আলোর বিকিরণ হচ্ছে। এদের নাম "রূপালী-মেঘ" (noctilucent clouds)। কিভাবে এদের সৃষ্টি হয়েছে এখনও বোঝা যায় নি। অত উঁচুতে তুষারের অস্তিত্ব কল্পনা করাও কঠিন। হয়ত বা অতি পাতলা উল্কাভস্ম বা ধুলোর জমাট পাঁজা হ'তে পারে।

তাপমাত্রা : তাপের বাজেট

দেখা যাচ্ছে, বায়ুমন্ডলের নানা জায়গার উষ্ণতা বিভিন্ন—কোথাও বেশী কোথাও কম। মোটামুটি উষ্ণতার পরিপেক্ষিতেই বায়ুমণ্ডলের স্তর বিভাগ করা হয়েছে। উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রার পরিবর্তনের একটা ধারণা পাওয়া যাবে চিত্র ১৬ থেকে।

ট্রোপোস্ফিয়ারে মাটি থেকে যত উপরে ওঠা যাবে উষ্ণতা তত কম্‌তে থাকবে। ট্রোপোস্ফিয়ারের উপরের সীমানা ট্রোপো-পজ, সেটা প্রায় 16-18 কিলোমিটার উঁচুতে,

অবশ্য মেরু অঞ্চলে মাত্র 8-10 কিলোমিটার উঁচুতে। মাটি থেকে ট্রোপোপজ পর্যন্ত তাপমাত্রা একইভাবে কম্‌তে কম্‌তে গিয়ে প্রায় −55°C-এ পেঁছয়। সব চেয়ে উঁচু পর্ব্বতশৃঙ্গ মাত্র 8·8 কিলোমিটার উঁচু (এভারেষ্ট)—অর্থাৎ ট্রোপোস্ফিয়ারের মাঝামাঝি পর্যন্ত গিয়েছে। পর্ব্বতশৃঙ্গটি চিরতুষারে আবৃত। এরকম উচ্চতায় তাপমাত্রা থাকে মোটামুটি −45°∼−50°C। ভূপৃষ্ঠের কাছে ট্রোপোস্ফিয়ারের প্রতি কিলোমিটার উচ্চতায় তাপমাত্রা গড়ে 5°-6° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কমে যায়। আর একটু উপরে প্রতি কিলোমিটারে উষ্ণতা 10°C করে কমতে থাকে।

ট্রোপো-পজ থেকে উপরের দিকে প্রায় 35-40 কিলোমিটার পর্যন্ত কিন্তু উষ্ণতার পরিবর্তন অতি সামান্য দেখা যায়। অর্থাৎ ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার মণ্ডলের নীচের অংশে তাপমাত্রা প্রায় স্থির, −55°C এর কাছাকাছি থাকে। এটাই স্ট্রাটোস্ফিয়ারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এর পরেই উচ্চতার সাথে আবার তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং পঞ্চাশ কিলোমিটার উঁচুতে বায়ুস্তরের তাপমাত্রা দেখা যায় শূন্য ডিগ্রি (0°C) অথবা তারও বেশী। এটা ওজোন স্তর।

এই উষ্ণ ওজোন স্তরটি যে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার উঁচুতে রয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে শব্দ-তরঙ্গের প্রতিফলন থেকে। শব্দ-তরঙ্গ বস্তুর মাধ্যমেই শুধু প্রসারিত হতে পারে। এই শব্দের পরিব্যাপ্তি সম্পর্কে একটা প্রমাণসম্মত মতবাদ রয়েছে যে
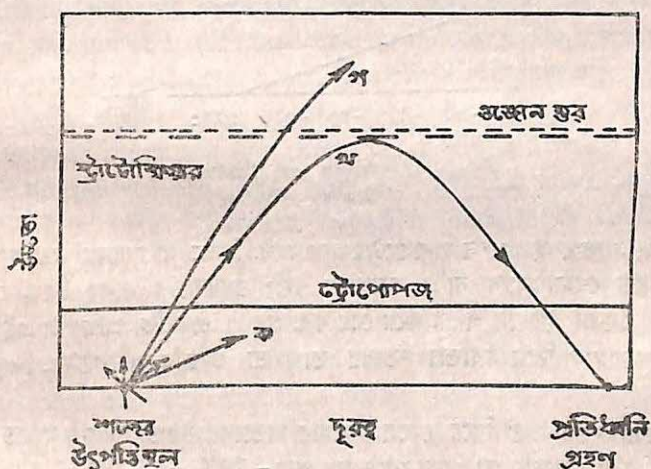
চিত্র ১৭। উষ্ণতর বায়ুস্তর থেকে শব্দের প্রতিফলন

কম উষ্ণ বস্তুর মাধ্যম থেকে উষ্ণতর বস্তুর মাধ্যমে শব্দ-তরঙ্গ পরিচালিত হ'লে, তরঙ্গ বেঁকে যায় তার পুরানো পথ থেকে। যেমন আলোর তরঙ্গ বাতাস থেকে কাচ বা জলের মধ্যে প্রবেশ করলে বেঁকে যায় বা প্রতিসারিত হয়। এমনকি, উপযুক্ত কোণ থেকে যদি

শব্দ-তরঙ্গ উষ্ণতর বায়ুস্তরে এসে প্রবেশ করতে চায় তা হ'লে সেই তরঙ্গও প্রতিফলিত হয়ে মাটিতে ফিরে আসতে পারে। ভূপৃষ্ঠ থেকে শব্দতরঙ্গ উঠে স্ট্রাটোস্ফিয়ারে প্রবেশ করে এবং উপরের দিকে উঠ্‌তে থাকে। পঞ্চাশ কিলোমিটার উচ্চতার কাছে এলে যখন উষ্ণতর ওজোন স্তরের সংস্পর্শে আসে তখন তরঙ্গের গতিপথ বেঁকে যায় এবং প্রতিফলন হয়। শব্দ-তরঙ্গ তখন ভূপৃষ্ঠের দিকে ফিরে আসে (চিত্র ১৭)। প্রতিফলিত তরঙ্গ যেখানে ফিরে এসে পৌঁছয় সেখানে শব্দ শোনা যায়। যেমন, কল্পনা করা যাক্, কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম থেকে কামান ছোঁড়া হল। কামান-গর্জ্জনের খানিকটা শব্দ-তরঙ্গ উপরে উঠে গিয়ে উষ্ণতর বায়ুস্তরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে
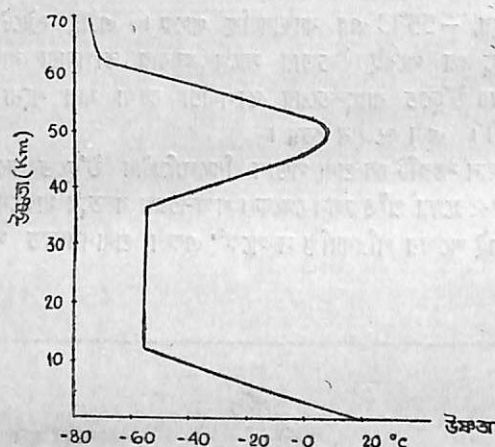
চিত্র ১৮। ট্রোপোস্ফিয়ার এবং স্ট্রাটোস্ফিয়ারের উষ্ণতার পরিবর্ত্তন

আসবে এবং হয়ত সেই গর্জ্জন রানাঘাটে শোনা যাবে, কিন্তু মাঝখানের বারাকপুর বা কাঁচড়াপাড়াতে শোনা যাবে না। কলকাতা এবং রানাঘাটের দূরত্ব ইত্যাদি থেকে উষ্ণস্তরের উচ্চতা ইত্যাদি গণনা করে বের করা হয়। এমনকি, আজকাল এই ধরনের নানা শব্দ-তরঙ্গ পাঠিয়ে বিভিন্ন স্তরের তাপমাত্রা ও তাঁর পরিবর্তনও নির্ণয় করা হচ্ছে।

ওজোনের স্তরটি পেরিয়ে গেলে আবার বাতাসের উষ্ণতা সমানে কমতে থাকে। 80 কিলোমিটার উচ্চতায় তাপমাত্রা নেমে যায় প্রায় $-70^{\circ}C \sim -80^{\circ}C$ এ। অর্থাৎ উষ্ণ স্তরটি রয়েছে দুইটি অতি শীতল স্তরের মাঝখানে। ট্রোপো এবং স্ট্রাটোস্ফিয়ারের উষ্ণতার বৈচিত্র্য ১৮ নং চিত্রে দেখান হয়েছে।

স্ট্রাটোস্ফিয়ারের উপরেই আয়নোস্ফিয়ারের স্তর 80 থেকে অন্ততঃ 800 কিলোমিটার পর্য্যন্ত। এখানে গ্যাসের অর্থাৎ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ নিতান্তই কম। আয়নোস্ফিয়ারের শুরু থেকেই তাপমাত্রা উচ্চতার সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুত

বেড়ে যায়। এখানে উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রার পরিবর্তনের ধারণাটা নীচের তালিকা থেকে পাওয়া যাবে ঃ

উচ্চতা (কিলোমিটার)	উষ্ণতা (°C)
80	−80°
200	+500°
500	+1000°

এর কারণ সৌরকিরণের শক্তিশালী ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণ দ্বারা অক্সিজেনের অণুগুলি (এবং নাইট্রোজেনেরও খানিকটা) প্রথমে পরমাণুতে বিযোজিত হ'য়ে পড়ে। তারপর পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বিচ্যুত হ'য়ে সেগুলো আয়নে পরিণত হয়। বিজ্ঞানীদের সংকেতে,

$$O_2 \rightarrow O+O\ ; \quad O \rightarrow O^{++}+2e$$
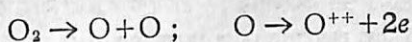
এই প্রক্রিয়াতে প্রচুর সৌরশক্তির শোষণ হতে থাকে এবং তারই ফলে তাপমাত্রা ভীষণভাবে বেড়ে যায়। তাপমাত্রার এই ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকে অনেক উপরেও—বহিঃস্তরেও। তারপর বায়ুস্তরের শেষে মহাশূন্যে নিশ্চয়ই অতিশীতলতা বিরাজমান।

বিভিন্ন স্তরের তাপমাত্রা জানার জন্যে নানারকম উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে। নীচের দিকে, বিশেষ করে ট্রোপোস্ফিয়ারে এবং প্রায় 25 কিলোমিটার পর্য্যন্ত উচ্চতায় বেলুনের সঙ্গে থার্মোমিটার জুড়ে দিয়ে তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত সহজে মাপা যাচ্ছে। এখন বেলুনের স্থান ছোট ছোট রকেট নিয়েছে। শুধু যে তাপমাত্রা মাপছে তা নয়। স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় রেডিয়ো তরঙ্গের সাহায্যে সেই তাপমাত্রার হিসাব সঙ্গে সঙ্গে এসে ল্যাবরেটরীতে পৌঁছুচ্ছে। আরও উপরে রকেট পাঠান যায় বটে, তবে তাপমাত্রা মাপার অসুবিধা আছে। কারণ রকেটের সঙ্গে বায়ুর ঘর্ষণে এত তাপ উদ্ভূত হয় যে সঠিক তাপমাত্রা পাওয়া যায় না। ওজোন স্তরের কাছাকাছি বায়ুর উষ্ণতা শব্দ প্রতিফলনের সাহায্যে নির্ণীত হয়। রকেটে করে ছোট ছোট বোমা নিয়ে গিয়ে উঁচু স্তরে ফাটিয়ে আরও উঁচু এবং উত্তপ্ত বায়ুস্তরের উষ্ণতা মাপার চেষ্টাও হয়েছে। এভাবে 80-90 কিলোমিটার পর্য্যন্ত বায়ুস্তরের উষ্ণতা জানা যায়। রকেটের মধ্যে চাপ বা ঘনত্ব পরিমাপক যন্ত্রও সন্নিবিষ্ট করা হয়। বিভিন্ন স্তরের চাপ এবং ঘনত্ব এভাবে জানতে পারা যায়। এবং সেই ঘনত্ব থেকে উষ্ণতার পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব। খুব উঁচু স্তরের তাপমাত্রা আজকাল কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে জানা যায়। কৃত্রিম উপগ্রহ যখন পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে তখন তার গতিবেগের তারতম্য ঘটে। বাতাসের বাধার জন্যই এটা হয়। এই গতিবেগের পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে সেই স্তরের বাতাসের ঘনত্ব এবং পরোক্ষ-ভাবে উষ্ণতা জানা সম্ভব।

পৃথিবী তার শক্তি আহরণ করছে দু'টি উৎস থেকে। প্রথমতঃ, পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ, যেমন ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদি, রয়েছে তাদের বিভাজনের ফলে সর্ব্বদা প্রচুর তাপশক্তির সৃষ্টি হচ্ছে। তবে এই তাপশক্তি প্রধানতঃ পৃথিবীর অভ্যন্তরে, বিশেষ করে কেন্দ্রেই থেকে যায়। বায়ুমণ্ডলীতে এখন তার প্রায় কিছুই আসে না। দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে সৌররশ্মি। সর্ব্বক্ষণ প্রতি মুহূর্ত্তে সূর্য্য থেকে প্রচুর

রশ্মি এসে পৃথিবীতে পড়ছে। এই রশ্মি নানা রকমের তরঙ্গাকারে আসছে—কোনটা অতি-বেগুনী, কোনটা আলোক-রশ্মি, আবার কোনটা তাপ-তরঙ্গ। এই সব রশ্মি থেকে পৃথিবী পাচ্ছে অপরিসীম শক্তি। নিরন্তর এই শক্তি না পেলে আমাদের রোজকার কাজকর্ম ত চলতই না, এমন কি তাপমাত্রা এত বেশী নেমে যেত যে জীবজগত লোপ পেয়ে যেত। বলতে পার, কয়লা বা পেট্রোল পুড়িয়ে শক্তির যোগান দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কয়লা পুড়ে যে শক্তির উৎপাদন হচ্ছে তার মূলেও রয়েছে সৌরশক্তি। বহু বহু যুগ আগে সূর্য্যকিরণের সাহায্যে বনজঙ্গল সৃষ্টি হয়েছিল। কালক্রমে সেই বনজঙ্গল মাটির নীচে চাপা পড়ে আজ কয়লায় পরিণতি লাভ করেছে—কয়লাতে সেই সৌরশক্তিই আবদ্ধ হ'য়ে আছে। কাঠ বা পেট্রোলেরও সেই একই ইতিহাস।

সূর্য্য থেকে যে রশ্মি এসে আমাদের বায়ুমণ্ডলে পৌঁছয় তার শক্তির পরিমাণ গড়ে প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে প্রতি মিনিটে 1·94 ক্যালোরি। এটাকে আমরা বলি সৌররশ্মি-ধ্রুবক বা Solar constant। [এক ক্যালোরি তাপ দিয়ে এক গ্রাম জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়ান যায়।] এই প্রচুর সৌরশক্তির খানিকটা টেনে নেয় বায়ুস্তরগুলি, আর বাকীটা ভূতলে এসে হাজির হয়। এই শক্তির সাহায্যেই ভূতল এবং বায়ুমণ্ডল তাদের তাপমাত্রা রাখতে পারছে। শতশত বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে পৃথিবী-পৃষ্ঠের বা বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা একই রয়েছে, কোন বৈলক্ষণ্য নেই। কিন্তু প্রতিনিয়ত সূর্য্যকিরণ গ্রহণের ফলে উষ্ণতা অনেক বেড়ে যাওয়া উচিত ছিল। তাপমাত্রা না বাড়বার কারণ, পৃথিবীও উত্তপ্ত হয়ে তাপ বিকিরণ করছে সর্ব্বদা। এমন একটা সাম্যাবস্থা পৌঁছে গেছে এখন, যে গড়ে সূর্য্য থেকে যতটা শক্তি আসছে ততটাই আবার পৃথিবী থেকে নানা উপায়ে চ'লে যাচ্ছে। ফলে তাপমাত্রার বিশেষ কোন ব্যতিক্রম হচ্ছে না। একটা কথা মনে রাখতে হবে, যে উৎস থেকে রশ্মির বিকিরণ হয় তার উষ্ণতার উপরে কি ধরনের কিরণ বিকীর্ণ হবে সেটা নির্ভর করে। ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা গড়ে 10°C আর সূর্য্যের বহির্মণ্ডল, যেখান থেকে কিরণ বেরিয়ে আসে তার তাপমাত্রা 6000°C। সুতরাং পৃথবী যে সকল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি বিকিরণ করে আর সূর্য্য যে সব রশ্মি আমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছে সেগুলো এক রকমের নয়। সৌর-কিরীট থেকে যে কিরণচ্ছটা আস্‌ছে তার বেশীর ভাগই আলোর তরঙ্গ—যার সাহায্যে আমরা সব কিছু দেখতে পাই। আলোকরশ্মি ছাড়াও তার সঙ্গে থাকে তাপরশ্মি এবং খানিকটা অতি-বেগুনী ও এক্সরে-জাতীয় অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গের রশ্মি। অপর দিকে পৃথিবী থেকে যে রশ্মি বেরিয়ে যায় তার সবটাই তাপরশ্মি — অপেক্ষাকৃত বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের। সূর্য্য থেকে পাওয়া এবং পৃথিবী থেকে হারানো নানা রকমের রশ্মির একটা ধারণা ১৪নং চিত্র থেকেই সহজে বোঝা যাবে। দেখা যাচ্ছে সূর্য্য থেকে এক শ্রেণীর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি আসছে আর পৃথিবী থেকে অন্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি চলে যাচ্ছে। এই সমস্ত রশ্মিই তাড়িত-চুম্বকীয় তরঙ্গ। কিন্তু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পার্থক্যের জন্য ওদের প্রকৃতি ও ধর্ম বিভিন্ন। যেমন, অক্সিজেন এবং ওজোন অনেক অতি-বেগুনী রশ্মি শোষণ ক'রে নিতে পারে। জলীয় বাষ্প বা কার্বন-ডাইঅক্সাইড সেটা পারে না। আবার দীর্ঘ তরঙ্গের তাপরশ্মিকে জলীয় বাষ্প প্রচুর শোষণ করে, কিন্তু ওজোন বা অক্সিজেনের

পক্ষে সেটা সামান্য সম্ভব। চিত্রটির নীচে কোন গ্যাস কি রকম তরঙ্গ শোষণ করতে পারে সেটাও দেখান হয়েছে।

সৌররশ্মি যখন বায়ুমণ্ডলের ভিতরে আসে, বহিঃস্তর আর আয়নোস্ফিয়ারে যে সামান্য অক্সিজেন আছে সেটা ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মিগুলি শুষে নেয়। 1800A° পর্যন্ত সব রকম দৈর্ঘ্যের রশ্মি অক্সিজেন গ্রহণ করে আর এই তরঙ্গগুলির শক্তি প্রচুর। ফলে এই সকল স্তরের বাতাসের উষ্ণতা অত্যন্ত বেড়ে যায় আর অণুগুলি বিয়োজিত হয়ে আয়নে পরিণত হয়। এরপর সৌরকিরণ যখন 70-80 কিলোমিটার উচ্চতার বায়ুস্তরে এসে উপস্থিত হয় তখন সেখানকার হাল্‌কা বাতাসে বিশোষণ সাময়িকভাবে খুব কমে যায়। তাই এখানকার বায়ুস্তর অত্যন্ত শীতল। আর একটু নীচে এলে, 50-55 কিলোমিটার উচ্চতায় বাতাসের ঘনত্ব খানিকটা বাড়ে এবং সেখানকার অক্সিজেন তখন অতি-বেগুনী তরঙ্গগুলিকে শোষণ করে নিয়ে ওজোনে পরিণত হয়। ওজোনের নিজেরও আবার অতি-বেগুনী আলোক শোষণ করার ক্ষমতা আছে। তাই ওখানে যে ওজোন তৈরী হ'ল সেটাও অবশিষ্ট অতি-বেগুনী রশ্মির প্রায় সবটাই শুষে নেয়। ওজোন স্তরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার এটাই হেতু। এই পঞ্চাশ কিলোমিটারের উপরেই 3000A° পর্যন্ত ছোট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলি সমস্ত অপসারিত হ'য়ে যায়। ওজোন স্তর পেরিয়ে 50 কিলোমিটারের নীচে যে সূর্য্যরশ্মি আসে তাতে কেবলমাত্র আলোক আর তাপরশ্মিই থাকে। এরপর এ সকল রশ্মি প্রবেশ করে ট্রোপোস্ফিয়ারে।
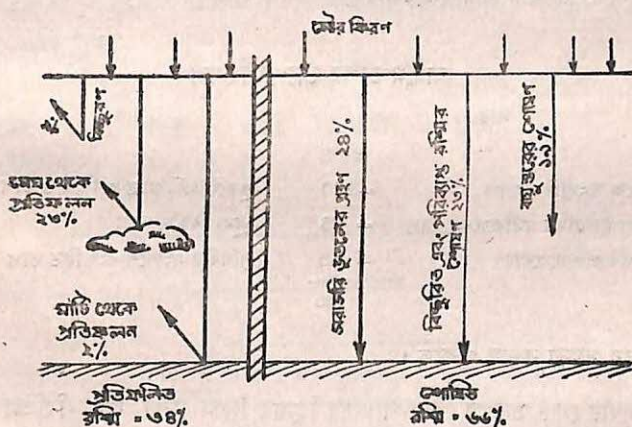
চিত্র ১৯। বায়ুস্তরে সৌরকিরণের বিলিবণ্টন

এখানে রয়েছে প্রচুর ধূলিকণা, জলীয় বাষ্প, মেঘ। এরা খানিকটা তাপ এবং, কিছুটা আলোকরশ্মি শোষণ করে। আবার রশ্মির কিছু অংশ বিচ্ছুরিত ও প্রতিফলিত হ'য়ে ফিরে যায়। বাকী রশ্মি এসে ভূতলে উপস্থিত হয় এবং তাকে উত্তপ্ত ক'রে তোলে। ভূতল থেকেও খানিকটা রশ্মি ঠিকরে উপরের দিকে ফিরে যায়। অর্থাৎ প্রতিফলিত হয়। চিত্র ১৯-এ আমাদের পৃথিবীতে আসা সৌররশ্মির কতটা কোথায়

যায় তার একটা হিসেব রয়েছে। এই সৌরশক্তির অবিরাম প্রবাহ আছে বলেই ভূতল ও বায়ুমন্ডল তাদের তাপমাত্রা বজায় রাখতে পারছে। আবার এই শক্তির পরোক্ষ সাহায্যেই বায়ুপ্রবাহ, ঝড়, ঝঞ্ঝা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি চলছে। সেটা পরে আলোচনা করা যাবে।

যে সৌরতাপ পৃথিবী পায়, তার বেশীর ভাগটাই সমুদ্র থেকে জল বাষ্পীভূত হ'তে ব্যয় হয়। তাছাড়া, উত্তপ্ত পৃথিবী থেকে তাপরশ্মি বিকিরণ হ'তে থাকে। এই তাপরশ্মি সবই দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এবং সামান্য একটু উপরে উঠলেই জলীয় বাষ্প এবং কার্বন-ডাইঅক্সাইড সেই রশ্মি শোষণ ক'রে তাপিত হ'য়ে পড়ে। এদের উষ্ণতা বেড়ে যাওয়াতে এদের মধ্য থেকে আবার তাপ নির্গত হ'য়ে খানিকটা উপরের দিকে এবং খানিকটা নীচের দিকে আসে। ঊর্ধ্বমুখী রশ্মিকে আবার উপরের জলীয় বাষ্প শোষণ করে এবং একই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এর মোট ফল হ'ল, নীচের দিকের উষ্ণতা যায় বেড়ে এবং যত উপরে যাবে উষ্ণতা কমবে। ট্রোপোস্ফিয়ারে তাই হয়। কিন্তু ট্রোপো-পজের কাছে গেলে আর মেঘ বা বাষ্প থাকে না। তাই তাপরশ্মি সোজা উপরে চলে যায়। সেখানে তাপের কোন শোষণ হয় না, তাই সেখানে বাতাসের তাপমাত্রা বাড়ে না, অর্থাৎ স্ট্রাটোস্ফিয়ার সৃষ্টি হয়।

আমাদের এ আলোচনা বায়ুমন্ডলকে নিয়ে। শুধু বায়ুস্তরগুলোর তাপ দেওয়া-নেওয়ার বাজেট যদি বিবেচনা করি, তাহ'লে দেখা যায় বায়ুমণ্ডলে একটা সাম্যাবস্থা রয়েছে। তাপের আয় আর ব্যয় মোটামুটি সমান।

বায়ুমণ্ডলের তাপের হিসাব

আয়	একক	ব্যয়	একক
পৃথিবী থেকে উৎসারিত তাপ	=120	ভূতলে পরিব্যাপ্ত ও বিক্ষিপ্ত তাপ	=106
জলীয় বাষ্প ইত্যাদির ঘনীভবনের তাপ	= 23	শূন্যে বিকীর্ণ তাপ	= 47
সৌর তাপের প্রত্যক্ষ শোষণ	= 13	পৃথিবীর সংস্পর্শে সংবাহিত তাপ	= 3
	156		156

এভাবে সমতা বজায় থাকছে।

পৃথিবীর মোট তাপের দেনা-পাওনার হিসাব নিলে দেখা যায়, বিভিন্ন অক্ষাংশে তাপের দেনা-পাওনা এক নয়। 38°N থেকে 38°S অক্ষাংশের মধ্যের পৃথিবী যতটা সৌরতাপ পায়, দেয় তার চেয়ে কম, অর্থাৎ এই অংশে তাপের উদ্বৃত্ত বাজেট রয়েছে। কিন্তু 38° ডিগ্রি থেকে মেরু পর্যন্ত পৃথিবীর অংশে যতটা সৌরতাপ পাওয়া যায়, তার চেয়ে অনেকটা বেশী তাপ উৎসারিত হ'য়ে চলে যায়। চিত্র ২০ থেকে সেটা অনায়াসে বোঝা যাবে।

ভূতলের সব জায়গা সমান সৌরকিরণ পায় না। নিরক্ষরেখা অঞ্চলে কিরণ খাড়াভাবে এসে পড়ে, কিন্তু সেই একই পরিমাণ কিরণ উচ্চ অক্ষাংশে বা মেরুর কাছে

তির্যকভাবে এসে অপেক্ষাকৃত বেশী জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। তাই উচ্চতর অক্ষাংশের তুলনায় বিষুব-রেখা অঞ্চলে সময়াতন ক্ষেত্রে বেশী পরিমাণ রশ্মি পাওয়া
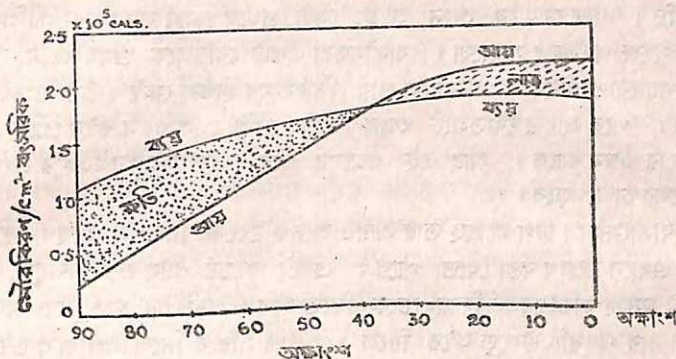
চিত্র ২০। বিভিন্ন অক্ষাংশে তাপের বাজেট

যায় (চিত্র ২১)। তাছাড়া উচ্চ অক্ষাংশে রশ্মিকে বায়ুস্তর ভেদ করে অপেক্ষাকৃত বেশী পথ যেতে হয় বলেও তীব্রতা খানিকটা কমে আসে। বিভিন্ন জায়গায় তাপমাত্রা বিভিন্ন হওয়ার এসব বড় কারণ। দিবালোক কতক্ষণ পাওয়া যাবে তার উপরেও সৌর রশ্মির পাওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে। দিবালোকের সর্বাধিক সময়ের হিসেব বিভিন্ন অক্ষাংশে নিম্নরূপ ঃ

অক্ষাংশ	0°	17°	49°	$66\frac{1}{2}$°	67·2°	90°
দিবালোকের সময় (সর্বাধিক)	12 ঘণ্টা	13 ঘণ্টা	16 ঘণ্টা	24 ঘণ্টা	1 মাস	6 মাস
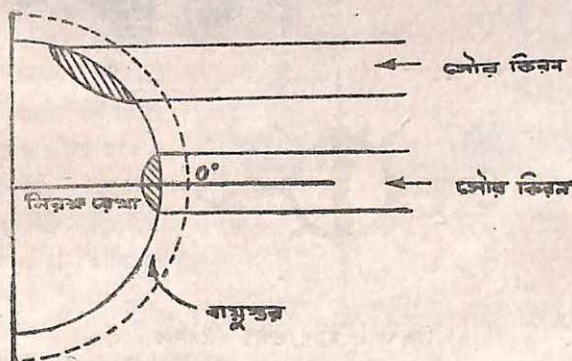
চিত্র ২১। বিভিন্ন অক্ষাংশে সৌরকিরণের বিস্তৃতি

পৃথিবীর তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশী দেখা গেছে আফ্রিকার লিবিয়া দেশের আজিজিয়াতে। সেখানকার উষ্ণতা 136° F (57·7°C)। আর সবচেয়ে কম তাপমাত্রা পাওয়া গেছে সোভিয়েটের ভোস্টক ষ্টেশনে, উষ্ণতা −127° F (−88·3°C)।

বায়ুচাপ

বাতাস হালকা বটে, তবে তারও ওজন রয়েছে ; সেই ওজনের কথা আগেই আলোচনা করেছি। বাতাসের যে ওজন আছে, সেটা প্রথমে প্রমাণ ক'রে দেন গ্যালিলীও একটা খুব সহজ পরীক্ষার সাহায্যে। বাতাসভরা একটা বোতলকে প্রথম ওজন করা হ'ল। তারপর বোতলটিকে গরম করলে তার ভিতরকার হাওয়া ফেঁপে উঠে খানিকটা বেরিয়ে গেল। পরে আবার বোতলটি ওজন করলে দেখা গেল ওজন ক'মে গেছে। অতএব হাওয়ার ওজন আছে। আর এই ওজনের জন্যেই ভূতলের সব কিছুর উপরেই বায়ুমণ্ডলের চাপ পড়বে।

বাতাসের যে চাপ রয়েছে তার আরও অনেক রকমের নিদর্শন আছে। দুই একটির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। একটা কাচের গ্লাস জলে সম্পূর্ণ ভর্তি ক'রে একটা মসৃণ কার্ড বোর্ড দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। তারপর হাত দিয়ে কার্ডবোর্ডটি চেপে ধরে গ্লাসটি উপুড় ক'রে দিলে এবং হাত সরিয়ে নিলে জল বা কার্ডবোর্ড পড়ে যাবে না। কার্ডবোর্ডটি গ্লাসের সঙ্গেই সেঁটে থাকবে। এর কারণ কার্ডবোর্ডের একদিকে জলের চাপ, অপরদিকে বাতাসের চাপ রয়েছে। হাওয়ার চাপ বেশী বলেই কার্ডবোর্ড পড়ে যাচ্ছে না। বাতাসের যদি চাপ না থাকত তবে কার্ডবোর্ডটি পড়ে যেত আর জলও বেরিয়ে যেত।

জার্মানীর ম্যাগডেবার্গ শহরের বৈজ্ঞানিক গেরিক একটা সুন্দর পরীক্ষা করেছিলেন এবং তখনকার জার্মান সম্রাট ও অন্যান্যকে দেখিয়ে অবাক ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি দু'টি তামার অর্ধগোলক তৈরী করেছিলেন। এই অর্ধগোলক দু'টি ঠিক-খাপে খাপে
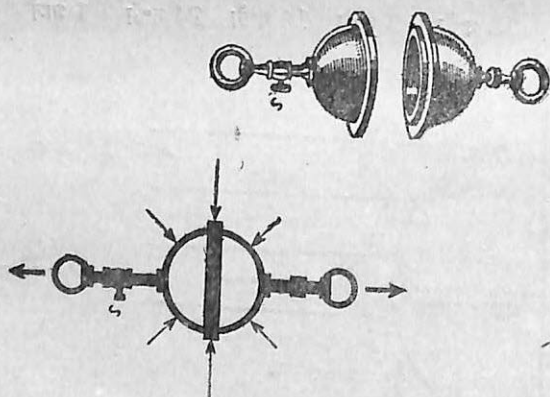
চিত্র ২২। ম্যাগডেবার্গ অর্ধগোলক

লাগান যেত। তখন একটি পূর্ণগোলক হ'ত। একটি অর্ধগোলকের সঙ্গে একটা স্টপকক লাগান ছিল, যাতে পাম্পের সাহায্যে গোলকের ভেতর থেকে সব বাতাস বের করে নেয়া যায়। অর্ধগোলক দুইটি একত্র জুড়ে, গোলকের ভেতরের বাতাস বের ক'রে দিয়ে ভেতরটা বায়ুশূন্য করা হ'ল। এখন দু'দিকের আংটা ধরে দু'জন খুব বলবান

লোক সজোরে টেনেও অর্ধগোলক দু'টিকে বিচ্ছিন্ন করতে পারল না। তখন এক একদিকে আটটা ক'রে ঘোড়া লাগিয়ে ষোলটা ঘোড়ার শক্তি দিয়ে শেষ পর্যন্ত দু'টি অর্ধগোলক আলাদা করতে পারা গেল। কিন্তু স্টপককের ভিতর দিয়ে বাতাস ঢুকিয়ে দিলে অনায়াসেই দু'টিকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। বায়ুশূন্য অবস্থায় ভিতরে কোন চাপ ছিল না, কিন্তু বাইরে থেকে বাতাসের প্রচন্ড চাপ ছিল, তাই দু'টিকে পৃথক করা দুঃসাধ্য হয়েছিল। এই পরীক্ষা থেকে বায়ুর চাপের অস্তিত্ব এবং তার প্রচণ্ড শক্তির প্রমাণ পাওয়া গেল (চিত্র ২২)।

ভূতলের এক বর্গসেন্টিমিটারের উপর বায়ুমন্ডলের উপরের সীমা থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত বাতাসের স্তম্ভের যে ওজন সেটাই সেখানকার বায়ুর চাপ। এই ওজনের পরিমাণটা জানার পদ্ধতি প্রথমে বের করেন গ্যালিলীওর শিষ্য টরিসেলী।

এক মুখ বন্ধ করা প্রায় এক মিটার লম্বা একটি কাচের নল টরিসেলী পারদ দিয়ে সম্পূর্ণ ভর্ত্তি ক'রে নিলেন। সেই নলটিকে তারপর উলটে দিয়ে খোলামুখটিকে একটা পারদপূর্ণ পাত্রে ডুবিয়ে দিলেন (চিত্র ২৩)। দেখা গেল, খানিকটা পারদ নল থেকে বেরিয়ে এল। সম্পূর্ণ পারদ কিন্তু নল থেকে বের হ'ল না। প্রায় 76 সেণ্টিমিটার উচ্চতা পর্যন্ত পারদ নলেই থেকে গেল। ভারী হওয়া সত্ত্বেও পারদ বেরিয়ে আসে না হাওয়ার চাপের জন্যে। পাত্রের পারদের ওপর হাওয়া চাপ দিচ্ছে, তার ফলে পারদ নলের মধ্যে উপরে উঠে রয়েছে। অতএব, নলের মধ্যের পারদের ওজন বাইরের বায়ুর চাপের সমান, অর্থাৎ নলের পারদের ওজন জানলেই সেখানকার বায়ুচাপ জানা যাবে।
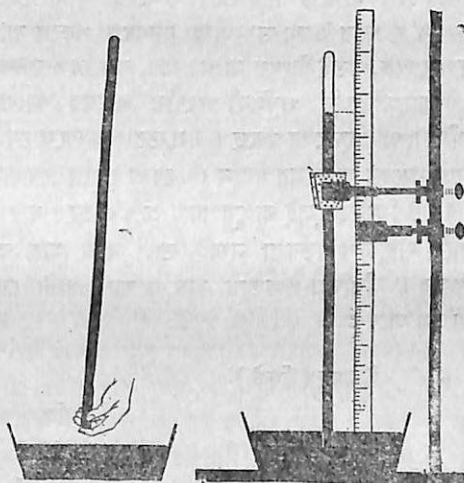
চিত্র ২৩। ব্যারোমিটার (পারদ)

নলের ভিতরে পারদের উচ্চতা যদি h সেন্টিমিটার হয়, তা হ'লে বায়ুচাপের (P) পরিমাণ হবে,

$$P = h \times 1 \times 13{\cdot}6 \times 981$$ ডাইন প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে

[পারদের ঘনত্ব, 13·6 ; অভিকর্ষাঙ্ক 981]

ল্যাবরেটরীতে যে সব পারদের চাপমান যন্ত্র বা ব্যারোমিটার সাধারণতঃ দেখা যায় সেগুলো এভাবেই তৈরী। এ ছাড়াও অন্য রকমের চাপমানযন্ত্র আছে, যেমন অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার, সেখানে কোন তরল পদার্থের প্রয়োজন হয় না।

সমুদ্র সমতলে শূন্য ডিগ্রি উষ্ণতায় বায়ুর চাপ মেপে দেখা গেছে 76 সেন্টিমিটার

(বা 29·92 ইঞ্চি) উচ্চতার পারদ স্তম্ভের ওজনের সমান। এই ওজনটা হচ্ছে 1·033 কিলোগ্রাম প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটারে অথবা 14·7 পাউন্ড প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে। এই বায়ুচাপের পরিমাণকে পদার্থবিদেরা চাপের একক বলে ধরেছেন এবং নাম দিয়েছেন এক অ্যাটমস্‌ফিয়ার।

∴ 1 অ্যাটমস্‌ফিয়ার = 76 সেন্টিমিটার উচ্চতার পারদ স্তম্ভ

কিন্তু আজকাল আবহতত্ত্বে চাপের আর একটি একক প্রচলিত হয়েছে। সেই এককটিকে বলা হয় "মিলিবার"। এক অ্যাটমস্‌ফিয়ার চাপ 1013·2 মিলিবারের সমান।

এক অ্যাটমস্‌ফিয়ার = 1013·2 মিলিবার = 76 সেন্টিমিটার পারদস্তম্ভ
অথবা এক মিলিবার = 0·075 সেন্টিমিটার পারদস্তম্ভ
কিংবা এক মিলিবার = 0·0295 ইঞ্চি পারদ স্তম্ভ

সমুদ্র সমতলে বায়ুর চাপ এক অ্যাটমস্‌ফিয়ার। কিন্তু যদি একটা উঁচু পাহাড়ের উপরে চাপ মাপতে চাই তবে উপরের সীমা থেকে সমুদ্র সমতল পর্যন্ত বাতাসের সম্পূর্ণ স্তম্ভের ওজন ত' আর সেখানে পড়বে না, সুতরাং চাপ কম হবে। বস্তুতঃ দেখা গেছে, যতই উপরে যাওয়া যায়, বায়ুচাপ ক্রমশঃ হ্রাস পায়।

বায়ুমণ্ডলের পৃথিবী-পৃষ্ঠের কাছের অংশটা বেশী ভারী। বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশই ভূতলের কাছে। সুতরাং ভূতলে যে বায়ুচাপ পড়ে তার বেশীর ভাগটাই হচ্ছে কাছের বাতাসের দরুন। দেখা গেছে মোটামুটি সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার বা প্রায় 18000 ফিট উঠলেই বায়ুর চাপ অর্ধেক হয়ে যায়। আর পনেরো কিলোমিটার উপরে গেলে বায়ুচাপ শতকরা নব্বই ভাগ কমে যায়, অর্থাৎ সেখানকার চাপ 0·1 অ্যাটমস্‌ফিয়ার। বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুচাপের একটা মোটামুটি ধারণা নীচের তালিকা থেকে পাওয়া যাবে ঃ

উচ্চতা (ফিট)	চাপ	
	মিলিবারে	পারদ-স্তম্ভ (ইঞ্চিতে)
সমুদ্র সমতল (0)	1013·2	29·92
5000	843·1	24·9
15000	572·0	16·9
25000	376·5	11·1
50,000	116·6	3·4

আজকালকার অনেক বিমানই খুব উঁচুতে চলাফেরা করে কিন্তু এত স্বল্প চাপে মানুষ থাকতে পারে না। ভিতরের চাপের জন্য চামড়া ফেটে গিয়ে রক্তক্ষরণ হবে। এই জন্য বিমানের অভ্যন্তরে কৃত্রিম উপায়ে ভূতলের মতো বায়ুচাপ রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

যে কোন তরল পদার্থকে ক্রমশঃ গরম করলে, উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে তার বাষ্পের চাপ বাড়তে থাকে এবং যে উষ্ণতায় গিয়ে পদার্থটির বাষ্পচাপ ঠিক তার উপরের

বায়ুচাপের সমান হবে, সেই উষ্ণতায় তরলটি ফুটতে থাকবে। এই তাপমাত্রাকে বলা হয় সেই পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক। যেমন, জলের কথা ধরা যাক। সাধারণ উষ্ণতায় (20°C) জলের উপরের বাষ্পচাপ মাত্র 1·75 সেন্টিমিটার। এখন উষ্ণতা বাড়িয়ে দিলে বাষ্পচাপ বাড়বে আর (সমুদ্র সমতলে) 100°C তাপমাত্রায় পৌঁছুলে জলের বাষ্পচাপ হবে ঠিক 76 সেন্টিমিটার, অর্থাৎ উপরের বায়ুচাপের সমান। তাই 100°C তাপমাত্রায় জল ফুটতে থাকবে। অর্থাৎ এক অ্যাট্‌মসফিয়ার চাপে জলের স্ফুটনাঙ্ক 100°C। দার্জিলিং কলকাতা থেকে অনেক উঁচুতে, সুতরাং দার্জিলিঙের বায়ুচাপ কলকাতার চেয়ে কম। অতএব কলকাতায় জল যদি 100°C এ ফুটতে থাকে, তবে দার্জিলিঙে জল আরও কম উষ্ণতায় ফুটবে। এর ফল হচ্ছে যে ডাল কলকাতার জলে সহজে সেদ্ধ হয়ে যায়, সেটাকে দার্জিলিঙে সেদ্ধ করতে অসুবিধা হয়, কারণ সেখানে ফুটন্ত জলের উষ্ণতা কম।

এক বর্গ সেন্টিমিটারের উপর বায়ুচাপ আমরা দেখেছি এক কিলোগ্রামেরও উপরে। একটি মানুষের গায়ের বর্গায়তন হবে প্রায় 14000 বর্গ সেন্টিমিটার। অতএব, তার দেহের উপরে বায়ুর চাপ পড়বে প্রায় 15500 কিলোগ্রাম বা অল্পাধিক পনের টন। এ রকম প্রচণ্ড চাপ আমরা সইতে পারি. কারণ ভেতর থেকেও অনুরূপ চাপ রয়েছে। সমস্ত প্রাণীই এরকম চাপ গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। যদি হঠাৎ বাইরের চাপটা চলে যায়, তাহ'লে ভেতরের চাপের জন্য আমাদের শিরাগুলো ফেটে যাবে। আমাদের ভেতরের কলকব্জা যাবে বিকল হয়ে। একটা তুলনা হ'তে পারে সাইকেলের টায়ারের সঙ্গে। আমরা টায়ারের ভেতর পাম্প করে ফুলিয়ে দিলেও সেটা ফেটে যায় না। কারণ বাইরে থেকে বায়ুচাপ ভেতরের চাপকে প্রতিহত করছে।

ঘরের কড়িকাঠে বা খাড়া দেওয়ালে টিকটিকিগুলো অতি স্বচ্ছন্দে চলে বেড়ায়, নীচে পড়ে যায় না। এর পেছনে রয়েছে বায়ুর চাপ। টিকটিকির পায়ের থাবার তলায় একটা খুব পাতলা পর্দা আছে। টিকটিকি যখন দেয়ালে পা চেপে ধরে তখন পর্দার মাঝখানটায় একটা গর্ত হ'য়ে যায়। পর্দা আর দেয়ালের মধ্যে তখন একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সেখানে কোন চাপ থাকে না অথচ বাইরে যথেষ্ট বায়ুচাপ রয়েছে। সুতরাং এই বায়ুচাপে তার পা দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে থাকে। এমনি ভাবে একটা একটা ক'রে পা আটকে রেখে, অন্য পাগুলো চালিয়ে সে এগুতে থাকে। তাই খাড়া দেওয়াল বা কড়িকাঠ থেকে ওরা পড়ে যায় না।

নানা কাজেই বায়ুর চাপ ব্যবহার হচ্ছে, যদিও সব সময় সেটা সহসা মনে আসে না। যে শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে আমরা বেঁচে আছি তার মূলেও রয়েছে, বাতাসের চাপ। শ্বাস গ্রহণের সময় আমাদের বুকের ভেতরের আয়তন বেড়ে যায় অর্থাৎ ভেতরের চাপ কমে, বাইরে থেকে বায়ু প্রবেশ করে। বায়ুচাপ না থাকলে বাতাস ঢুকত না। আবার নিশ্বাস ফেলার সময় বুকের গহ্বরের আয়তন সঙ্কুচিত হ'য়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড বের ক'রে দেয়। পাহাড়ে বা খুব উঁচু যায়গায় গেলে আমাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, কারণ সেখানে বায়ুর চাপ কম।

সাইফন, নানাধরনের বায়ু-পাম্প, নলকূপ ইত্যাদির পরিচালন বায়ুচাপ থাকার জন্যই সম্ভব হয়েছে। ডাবের জল সরু নল দিয়ে পান করার সময় বা ফাউন্টেন পেনে

কালি ভরার সময় পরোক্ষে বায়ুচাপেরই সাহায্য নিচ্ছি। আকাশে পাখী যে ভেসে বেড়াচ্ছে তাও বায়ুর চাপের জন্যই।

বায়ুপ্রবাহ

বাতাস সর্ব্বদাই সচঞ্চল, কখনও স্থির হ'য়ে থাকে না, থাকতে পারে না। কত বিচিত্র, কত অপূর্ব রূপে এর প্রকাশ। বৈশাখের খর মধ্যাহ্নে দেখেছি মহাযোগী সন্ন্যাসীর মতো স্থির নিষ্কম্প নিশ্চল হ'য়ে রয়েছে বাতাস। সে-ই আবার শরতের সন্ধ্যায় ঘরের কোণের গাছের শিউলি, বনজুঁই-এর মিষ্টি সৌরভ ব'য়ে নিয়ে এসে নব-বধূর মতো কানে কানে বলে গেছে, এইত আমি রয়েছি। শান্ত উষায় আমলকী বনের মাথায় মাথায়, নিম-পল্লবের কচি পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে, আদর ক'রে দুলিয়ে দিয়ে যেতে তাকে দেখেছি, দেখেছি তাকে অঘ্রাণের 'স্বর্ণ শীর্ষ আনমিত' ধানের ক্ষেতের ওপর কিশোর বালকের উল্লাসের মতো আনন্দের তরঙ্গে প্রসারিত। আষাঢ়ের সজল সন্ধ্যায় দেখেছি দূর শাল মহুয়ার বনে বাতাসের নৃত্য চঞ্চল পদসঞ্চার, শুনেছি শাখে শাখে উদ্বেল যৌবনের মর্ম্মর গুঞ্জন। দেখেছি কালবৈশাখীর উদ্দামতায় বাতাস সব বাধা বন্ধ ছেড়ে 'হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া, কম্পিয়া, স্খলিয়া বিকিরিয়া বিচ্ছুরিয়া প্রবাহিয়া চলে যায়......প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে উত্তরে দক্ষিণে পূরবে-পশ্চিমে।' প্রকৃতির এ আনন্দ-সমারোহ অপূর্ব্ব।

এবার কল্পনা ছেড়ে বাস্তবের রাজ্যে এসে একটু অঙ্কের হিসাব করি। অনেক সময় আমরা বলি, 'মোটেই বাতাস নেই', 'বাতাস একেবারে বন্ধ, গাছের একটা পাতাও নড়ছে না,'—তখনও কিন্তু বাতাস ব'য়ে যায়। তবে তখন তার গতিবেগ খুবই কম। আবার প্রবল ঝড়ের সময় প্রচণ্ড বেগে বাতাস ছুটে চলে। যখন একেবারে শান্ত তখনও প্রতি সেকেন্ডে বাতাস এক মিটার বেগে ব'য়ে চলে। যে প্রবাহে গাছের সরু ডালপালা দুলতে থাকে সে রকম প্রীতিকর মৃদুমন্দ বাতাসের গতিবেগ সেকেন্ড 5-7 মিটার হবে। ঝ'ড়ো-হাওয়ার বেগ খুব বেশী, সেকেন্ডে 30 মিটার হ'তে পারে। বাতাসের বিভিন্ন গতিবেগের একটা ধারণা নীচের তালিকায় পাওয়া যাবে ঃ

বায়ুর পরিচয়	গতিবেগ মাইল প্রতি ঘণ্টায়	বায়ুর প্রক্রিয়ার নিদর্শন
শান্ত	1—2	গাছের পাতা স্থির, চিমনীর ধোঁয়া সোজা উঠে যায়।
মৃদু-মন্দ	2—12	গাছের পাতা এবং সরু ডাল দুলতে থাকে।
তাজাবায়ু	13—23	জলে ঢেউ ওঠে, গাছের ডালপালা আন্দোলিত হয়।
প্রবল বায়ু	24—37	বড় বড় গাছ দুলতে থাকে, জানালার খড়খড়ি নড়ে।
ঝ'ড়ো-হাওয়া	37—55	জলে প্রচণ্ড ঢেউ হয়, ঘরের চাল উড়ে যায়, ছোট ছোট গাছ উপড়ে যায়, বড় বড় গাছও দুলতে থাকে।
প্রবল ঝড়	>55	ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়।

বিভিন্ন বায়ুপ্রবাহের মূলে কিন্তু রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় বায়ুচাপের অসমতা। কোথাও বায়ুচাপ বেশী আবার কোথাও কম। চাপের এই অসমান বিন্যাসের জন্য বাতাস উচ্চচাপ থেকে সর্ব্বদা নিম্নচাপের দিকে ব'য়ে যায়। আর চাপের এই অসম বিন্যাসের প্রধান কারণ বিভিন্ন অঞ্চলে তাপ একরকম ভাবে পড়ে না, ফলে উষ্ণতার তারতম্য ঘটে। বাতাস উষ্ণ হ'লে সেটা হালকা হ'য়ে উপরের দিকে উঠে যায়, নীচের চাপ কমে যায়, তাই অন্যদিকের উচ্চচাপের ঠাণ্ডা আর ভারী বাতাস সেখানে আসতে থাকে। বায়ুর প্রবাহ হ'তে থাকে।

ট্রোপোস্ফিয়ারের বায়ুমন্ডলে দেখা যায়, কয়েকটা প্রধান বায়ুস্রোত সব সময়েই মোটামুটি একই দিক থেকে ব'য়ে যায়। এদের বলা হয় "নিয়ত বায়ুপ্রবাহ"। নিরক্ষরেখার কাছে সৌরতাপ বেশী, সেখানকার উষ্ণ বাতাস উপরে উঠে যায়। তাই নিরক্ষরেখার খুব কাছের অংশে বাতাসের চাপ কম, অর্থাৎ এখানে পৃথিবী ঘিরে নিম্ন চাপের একটি বলয় রয়েছে। এখানে নীচের দিকের বাতাসের গতিবেগ বেশ কম এবং সীমিত অর্থাৎ বায়ুস্তর মোটামুটি প্রশান্ত। তাই এটাকে বলা হয় "নিরক্ষীয় শান্ত বলয়"। ইংরেজী নাম "ডলড্রামস" (Doldrums)।

এ রকম আরও শান্ত-বলয় রয়েছে। নিরক্ষরেখা থেকে যতই মেরুর দিকে যাওয়া যাবে, অক্ষাংশ বাড়ার সঙ্গে বায়ুচাপ বাড়তে থাকে, এবং কর্কট ও মকর ক্রান্তিতে গিয়ে সবচেয়ে উচ্চচাপ দেখা যায়। এই কর্কট ও মকর ক্রান্তিতে পৃথিবী ঘিরে আরও একটি
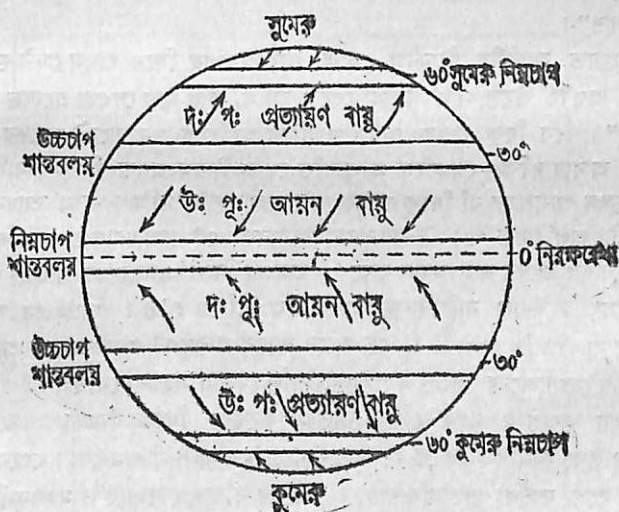
চিত্র ২৪ নিয়ত বায়ুপ্রবাহের গতির দিক

করে উচ্চচাপের শান্ত-বলয় রয়েছে। কর্কট এবং মকর ক্রান্তি ছাড়িয়ে গেলে প্রায় 70° অক্ষাংশে রয়েছে আবার দু'টি নিম্নচাপের বেষ্টনী। এরা 'মেরুপ্রদেশীয় নিম্নচাপ শান্ত বলয়'। এর পর মেরুর কাছে আবার বায়ুচাপ খুব বেশী (চিত্র ২৪)।

পূর্বে সমুদ্রতরী চলত পালের সাহায্যে। তখন উত্তর আমেরিকা থেকে পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ঘোড়া চালান যেত। কর্কটীয় শান্তবলয় দিয়ে যাবার সময় বায়ু-প্রবাহ প্রায় বন্ধ হয়ে থাকার জন্য জাহাজগুলোকে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হ'ত। পানীয় জলের অভাবের আশঙ্কায় তখন ঘোড়াগুলোকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হ'ত। এজন্য কর্কটীয় ও মকরীয় শান্তবলয় অঞ্চলকে নাম দেওয়া হয়েছিল "অশ্ব অক্ষবৃত্ত" (Horse latitudes)।

আগেই বলেছি, বাতাস উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে ব'য়ে চলে। তাই কর্কটীয় এবং মকরীয় উচ্চচাপ-বলয় থেকে বাতাস নিরক্ষরেখার দিকে এবং মেরু প্রদেশীয় নিম্ন চাপের বলয়ের দিকে বইতে থাকবে। কিন্তু বাতাস সোজাসুজি উত্তর থেকে দক্ষিণে বা দক্ষিণ থেকে উত্তরে ব'য়ে যায় না। তার কারণ পৃথিবীর আহ্নিক গতি। পৃথিবী তার মেরুদন্ডের উপরে 24 ঘন্টায় একবার ঘুরছে। নিরক্ষরেখার উপরে বা কাছাকাছি কোন স্থান একদিনে যতটা পথ ঘুরবে, মেরু অঞ্চলের কোন স্থানকে তার চেয়ে অনেকটা কম পথ পরিক্রমা করতে হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানের গতিবেগ বিভিন্ন হবেই। যেমন, সিঙ্গাপুর প্রায় নিরক্ষরেখার কাছে, সুতরাং দিনে তাকে 25000 মাইল ঘুরে আসতে হয়, আর লন্ডনকে (অক্ষাংশ 51°) ঘুরতে হয় মাত্র 15750 মাইল। আর সেই তুলনায় মেরুদেশের স্পিটবার্জেন দ্বীপ পরিক্রমা করে মাত্র সাড়ে চার হাজার মাইল। এর ফলে পৃথিবীর উপরের গতিশীল সব কিছুই উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে হেলে যায় আর দক্ষিণ গোলার্ধে সেগুলো বাঁ দিকে বেঁকে যায়। এটাকে বলে "ফেরেলের সূত্র"।

যে বায়ুস্রোত কর্কটীয় উচ্চচাপ থেকে নিরক্ষরেখার দিকে আসে সেটা ডান দিকে বেঁকে যায় অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসে, তার নাম দেওয়া হয়েছে "উঃ-পূঃ আয়ন বায়ু"। যে দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয় সেই অনুসারেই তাদের নামকরণ করা হয়। আবার দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তি থেকে নিরক্ষরেখার দিকে প্রবাহিত বায়ু ফেরেলের নিয়ম অনুসারে বাঁ দিকে বেঁকে যায় বলে' সেটা "দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু"। অয়ন শব্দটির অর্থ হচ্ছে পথ। এককালে নাবিকেরা এই বায়ুপ্রবাহ দেখে দিঙ্‌নির্ণয় করত। সুতরাং এদের নাম আয়ন বায়ু। আগের দিনে পালতোলা জাহাজ চলত এই বায়ুর সাহায্যে, সুতরাং বাণিজ্য-জাহাজের খুব সুবিধা হ'ত। তাই এর অপর নাম বাণিজ্য-বায়ু বা trade winds। এই আয়ন বায়ুর কল্যাণেই কলোম্বাসের আটলান্টিক মহাসাগর আর মেগালেনের প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেওয়া সহজ হয়েছিল।

উচ্চচাপের কর্কটীয় বলয় থেকে বাতাস উত্তরের দিকের নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয় এবং ডানদিক বেঁকে যাওয়ার জন্য এটা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে আসে। এ বায়ুকে বলে দঃ-পঃ প্রত্যায়ন বায়ু। আবার দক্ষিণ গোলার্ধেও মকরক্রান্তি থেকে দক্ষিণের দিকে উত্তর-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ু ব'য়ে যায়। প্রত্যায়ন বায়ুর বিদেশী নাম, Westerlies। দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তির পরে স্থলভাগ খুব কম। এখানে 40-50° দঃ অক্ষাংশে দঃ-পঃ প্রত্যায়ন বায়ু প্রবল বেগে শোঁ শোঁ ক'রে ব'য়ে যায়। এর জন্যে এখানে প্রত্যায়ন বায়ুকে একটা বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে, "গর্জনকারী চল্লিশা" (Roaring forties)। তাছাড়া সুমেরু বৃত্তের মধ্যে অতি শীতল উত্তর-পূর্ব বায়ু

দক্ষিণ দিকে ব'য়ে আসে, তাই সাইবেরিয়া এবং উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশ এত ঠান্ডা।
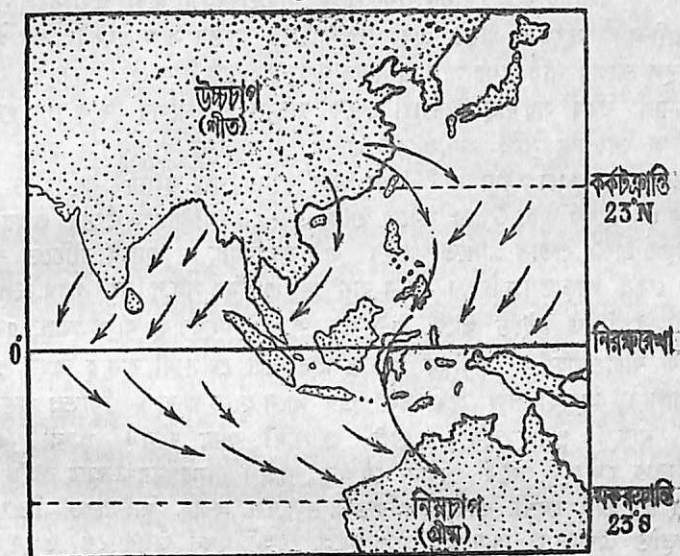
চিত্র ২৫। মৌসুমী বায়ু : পৌষ-মাঘ
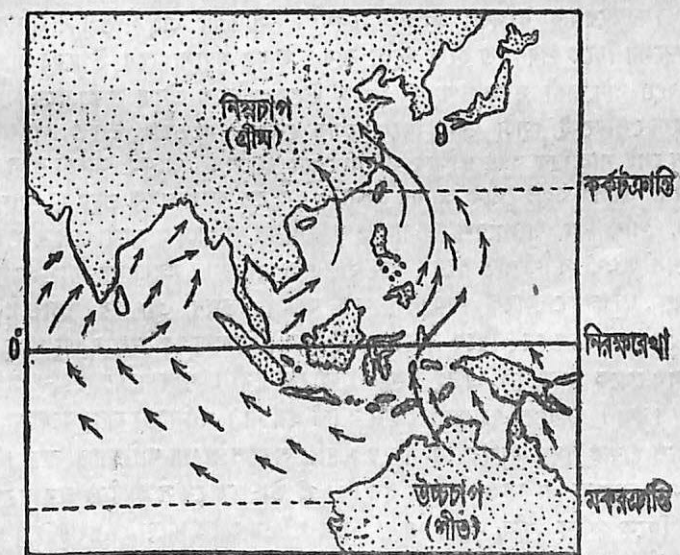
চিত্র ২৬। মৌসুমী বায়ু : আষাঢ়-শ্রাবণ

কুমেরু বৃত্তের মধ্যে তেমনি ব'য়ে যায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব অতি শীতল বায়ু। এই সব

বায়ুপ্রবাহগুলি সারা বছরই মোটামুটি একই রকম ভাবে বয়ে যায় ব'লে এদের "নিয়তবায়ু" বলা হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে বায়ুপ্রবাহের ধারা এত সরল নয়, বরং যথেষ্ট জটিল। সূর্য্যের উত্তর এবং দক্ষিণায়নের গতির সঙ্গে এবং বিভিন্ন অক্ষাংশে জল ও স্থল ভাগের পরিমাণের সঙ্গে এ সকল বায়ু প্রবাহের দিক এবং গতিবেগ অনেকটা বদলে যায়। তবে সর্বদাই উচ্চচাপ থেকে বাতাস নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়।

অনেক জায়গায় সময় অনুসারেও বায়ুর পরিচলনের পরিবর্তন হয়। জলের এবং স্থলের তাপমাত্রা সমান নয়। তার ফলে দিনের বেলা স্থলভাগ জলের চেয়ে বেশী গরম হয়। স্থলের বায়ু উপরে উঠতে থাকে, এবং সে জায়গায় সমুদ্রের ওপর থেকে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা বাতাস আসতে থাকে। এটা সমুদ্রবায়ু। আবার রাত্রিতে স্থলভাগ সমুদ্রের চেয়ে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হ'য়ে যায় এবং এ সময় সমুদ্র বেশী গরম বলে স্থলের বাতাস সেই দিকে বইতে থাকে, এটা স্থলবায়ু। সমুদ্রবায়ু বা স্থলবায়ু এরা হচ্ছে "সাময়িক বায়ুপ্রবাহ"। সাময়িক বায়ুপ্রবাহর মধ্যে মৌসুমী বায়ুর বিষয় প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। আরবী শব্দ "মৌসিম" এর মানে হচ্ছে ঋতু। বিভিন্ন ঋতুতে যে বিশেষ বায়ুর প্রবাহ হয় তাকেই মৌসুমী বায়ু বলে। পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলিতে মৌসুমীবায়ুর প্রাধান্য দেখতে পাই। নিরক্ষরেখা আর কর্কট ক্রান্তির মাঝখানে স্থল ভাগ বেশী, ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, মালয়, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, চীন প্রভৃতি এখানে। আমাদের গ্রীষ্মকালে সূর্য্য যখন উত্তরায়ণে তখন স্থলের উপরের বাতাস গরম হ'য়ে উপরে উঠে যায় এবং নীচে চাপ কমে যায়। এ সময়ে দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল, সেখানকার বাতাস বেশ শীতল এবং বায়ুচাপ বেশী। তাছাড়া নিরক্ষরেখার দক্ষিণে জলভাগ বেশী। সুতরাং এই শীতল সামুদ্রিক আর্দ্র বাতাস স্থলের দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে। ভারত মহাসাগরের উপরের বায়ুপ্রবাহ ফেরেল সূত্র অনুযায়ী দক্ষিণ-পূর্ব্ব থেকে উত্তর-পশ্চিমে বইতে সুরু করে। কিন্তু নিরক্ষরেখা পেরিয়েই সেটা ডান দিকে মোড় নেয়। সুতরাং ভারত, পাকিস্তান বা ব্রহ্মদেশে সেই সামুদ্রিক বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে আসে। একেই আমরা বলি দঃ-পঃ মৌসুমী। জলের ওপর থেকে আসার জন্যে এ বায়ুতে বাষ্প থাকে প্রচুর। পশ্চিমঘাট, হিমালয়, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশের পাহাড়ের গায়ে এসে শীতল হ'য়ে এই বাতাস যথেষ্ট বৃষ্টিপাত করে (চিত্র ২৫ এবং ২৬)। আমাদের শীতকালে সূর্য্য দক্ষিণায়নে, দক্ষিণ গোলার্ধে বায়ুচাপ যায় কমে। তখন এশিয়ার স্থলভাগ থেকে উত্তরের ঠান্ডা বাতাস সেই দিকে বইতে সুরু করে। ফেরেলের নিয়মে এই বায়ু উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে আসবে। এটাই উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমী। স্থলভাগের বায়ু-প্রবাহ, তাই এতে বাষ্প কম। ভারতে এর জন্যে কোন বৃষ্টি হয় না। খানিকটা বায়ু বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে যাবার সময় বাষ্প টেনে নিয়ে মাদ্রাজ অঞ্চলে অবশ্য বারিপাত করে। সেই জন্যে ঐসব অঞ্চলে শীতেও বৃষ্টি হয়। এই উঃ-পূঃ মৌসুমী নিরক্ষরেখা পেরিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে বেঁকে যায়, তখন এটা উত্তর-পশ্চিম মৌসুমীতে পরিণত হয়। এর ফলে অষ্ট্রেলিয়াতে বৃষ্টিপাত ঘটে।

পৃথিবীর স্থলভাগের উপরের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের জন্যও নানা জায়গায় স্থানীয় বায়ু-প্রবাহ দেখা যায়। যেমন, গ্রীষ্মকালে যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতের তাপমাত্রা খুব বেড়ে

যায়, তখন সেখানে অত্যন্ত কষ্টকর গরম হাওয়া দিনের বেলায় বইতে থাকে—এ হাওয়াকে আমরা বলি "লু"। চৈত্র-বৈশাখে পশ্চিমবঙ্গে বিকেলের দিকে প্রায়ই উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে প্রচণ্ড বেগে ঝড়ো-হাওয়া ব'য়ে যায়। অনেক সময়েই এর সঙ্গে বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টি থাকে। এরই নাম কালবৈশাখী বা Nor'wester। সাহারা মরুর উপর থেকে মিশরের দিকে খুব গরম ও শুকনো বাতাস বয়ে আসে, এর নাম "খামসিম"। খামসিমে থাকা খুব কষ্টকর আর শস্যও এতে নষ্ট হ'য়ে যায়। সাহারার খানিকটা বায়ুস্রোত ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে ইতালীর দক্ষিণেও যায়, সেটা অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ এবং কিঞ্চিৎ আর্দ্র। এই বায়ুপ্রবাহকে বলা হয় "সিরক্কো"। শীতকালে সাহারার এই বায়ুস্রোত প্রচুর বালুকণা নিয়ে গিয়ে উপকূলের দিকেও ব'য়ে যায়—তার নাম "হার্মাটান"। হার্মাটানে অনেক সময় গাছপালা শুকিয়ে যায়।

আল্পস্ পর্ব্বতের গা বেয়ে উত্তর দিকে সুইজারল্যান্ডে এক শুষ্ক বায়ুপ্রবাহ চলে, তার নাম "ফন"। তেমনি আমেরিকায় রকি পর্ব্বতের উপর থেকে শুষ্ক "চিনুক" বায়ুপ্রবাহ কানাডার দিকে প্রবাহিত হয়। আল্পস্ থেকে যে খুব ঠাণ্ডা হাওয়া আড্রিয়াটিক সাগরের দিকে আসে তাকে বলা হয় "বোরা"। ওরকম ঠাণ্ডা হাওয়া উত্তরের রোন উপত্যকা অঞ্চল থেকে ভূমধ্যসাগর উপকূলে বয়ে আসে, নাম "মিস্ট্রাল"। এমনি নানা দেশে নানা রকম বায়ুপ্রবাহের সন্ধান মেলে। সীমাবদ্ধ এলাকার ভিতরে ব'য়ে যায়, তাই এদের "স্থানীয় বায়ু" বলে ধরা হয়।

বায়ুপ্রবাহের জন্য অনেক সময় ভূপৃষ্ঠের অবস্থা বদলে যায়। বায়ু অনেক সময় প্রচুর বালুরাশি ব'য়ে নিয়ে এসে মরুভূমির সৃষ্টি করে ; ভারতের থর মরু এমনি করে উত্তর-পূর্ব্বে ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে। চীনে গোবি মরুর হলুদ বালু বাতাসের সঙ্গে গিয়ে "লোয়েস" মাটি তৈরী করেছে। আবার কখনও বালুকণাগুলো কঠিন শিলার সঙ্গে সংঘর্ষে এসে শিলাগুলোকে ক্ষয় ক'রে দেয়। সমুদ্রতটে এবং মরুপ্রান্তে যে প্রচুর বালি জ'মে বালিয়াড়ির সৃষ্টি হয়, তাও বায়ু-প্রবাহের জন্যেই।

এসকল বায়ুপ্রবাহ পৃথিবীর মাটির কাছাকাছি। ট্রোপোস্ফিয়ারের মধ্যেই অনেকটা উচুঁতে অর্থাৎ স্ট্রাটোস্ফিয়ারের একটু নীচে এক অপ্রশস্ত বায়ুস্রোত অনেক সময় অতি তীব্রবেগে বয়ে যায়। এসব বায়ুস্রোত সাধারণতঃ পশ্চিম দিক থেকে পূবের দিকে প্রচণ্ড বেগে ছোটে। এদের বলা হয় "জেটস্ট্রীম" (jet stream)। এদের বিরুদ্ধে দ্রুতগামী উড়োজাহাজও এগুতে পারে না। এরা অনেকসময়েই ঘণ্টায় চার-পাঁচ শত কিলোমিটার গতিতে প্রবাহিত হয়, বিশেষ করে 30-35° অক্ষাংশের খাড়া উপরে এদের প্রাবল্য বেশী।

শীতকালে জেটস্ট্রীমের গতিবেগ অনেক বেশী থাকে এবং প্রায় কর্কট-ক্রান্তির বরাবর উপরে থাকে। গ্রীষ্মকালে এই জেট-প্রবাহ চলে সুমেরু বৃত্তের সন্নিকটে। সারাবছর ধরে এই জেটস্ট্রীম ট্রোপোস্ফিয়ারের উপরস্তরে সাপের মতো একেঁ বেঁকে পৃথিবীর চারদিকে প্রবাহিত হয়। ফলে, কখনও এই প্রবাহ মেরু-অঞ্চলের খানিকটা শীতল বায়ুকে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে টেনে আনে, আবার কখনও নিম্ন অক্ষাংশের উষ্ণতর বায়ুকে মেরু-প্রদেশের উপরের শীতল মণ্ডলে পাঠিয়ে দেয়। এই জন্যই অনেক সময়, বিভিন্ন ঋতুতে জলবায়ুর মধ্যে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত বৈষম্য দেখা দেয়।

দক্ষিণ গোলার্ধেও এমনি একটা জেটস্ট্রীম রয়েছে। তবে জেটস্ট্রীম সর্বদাই অনেক অনেক উঁচুতে প্রবহমান। জেটস্ট্রীম সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও সীমিত। ওদের খামখেয়ালী গতিবিধিগুলো জানা গেলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার অনেক সুবিধা হবে এবং বৈজ্ঞানিকদের খুব উপকার হবে।

কেউ কেউ মনে করেন, পরিচলন ক্রিয়ার ফলে ঘূর্ণবাত আর প্রতীপ ঘূর্ণবাত এই দুইয়ের বৈপরীত্যে উচ্চস্তরে জেটস্ট্রীম জন্ম নেয়। আবার অনেকের ধারণা, মেরু থেকে আসা শীতল বায়ুস্রোত ও নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণবায়ুস্রোতের মিলিত হওয়ার সময় এই রকম জেটস্ট্রীমের উদ্ভব হয়। জেটস্ট্রীমের সব তথ্য এখনও জানা যায় নি। আশা করা যাচ্ছে, এটা একদিন আমাদের কাজে লাগবে। জেটস্ট্রীমে বিমান চলাচল করাতে পারলে গতি অনেক বাড়বে এবং জ্বালানি কম খরচ হবে। আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাসও আরও সঠিক ভাবে করা যাবে।

বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে যে গতিশক্তি বিধৃত রয়েছে, তার পরিমাণ প্রচুর। একটা বড় রকমের ঝড়ো হাওয়া যখন কয়েক শত মাইল প্রবাহিত হ'য়ে যায়, তার শক্তির পরিমাণ অনেকগুলো পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণের শক্তির চেয়েও বেশী। এই শক্তি অবশ্যই সূর্য্যের কাছ থেকে পাওয়া। সারা পৃথিবীতে আজ যখন শক্তির ঘাটতি দেখা দিয়েছে, তখন এই মারুত শক্তির খানিকটা কাজে লাগাতে পারলে সমস্যার অনেকটা সমাধান সম্ভব। কয়লা, কাঠ, তেল, পুড়িয়ে শক্তির উৎপাদন এখন পর্য্যাপ্ত নয়, আর তার ব্যয়ও অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এককালে এই বাতাসের শক্তি ব্যবহার ক'রেই ত' পাল-তোলা নৌকো নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া হ'ত। কোথাও কোথাও জল তুলতে বা গম-পেষাইয়ের কাজেও wind-mill বা বাত-চক্র ব্যবহৃত হ'ত। আজ অভাবে পড়ে আবার সেই মারুত শক্তির সন্ধান হচ্ছে। আমাদের দেশে বছরের অধিকাংশ সময়েই ত' জোর হাওয়া বেশ বেগে বইতে থাকে। এর শক্তিকে ব্যবহার-উপযোগী করার চেষ্টা চলছে। কোনো কোনো দেশে আজকাল খুব উঁচু স্টীলের পাইলনের উপর ২।৩টি ব্লেড-যুক্ত বিরাট পাখা বসান হয়; বায়ু-প্রবাহে সেই পাখা দ্রুত ঘুরতে থাকে। এই বাত-চক্রের সঙ্গে ডায়নামো বসিয়ে তার সাহায্যে শক্তিটুকুকে বিদ্যুতে পরিণত ক'রে নেওয়া হয়। বলা সহজ বটে, তবে কাজটি এত সহজ নয়। দিনের নানা প্রহরে বা বছরের নানা সময়ে বায়ুর গতিবেগ সমান থাকে না। কখনও পাখা হয়ত একেবারেই চলবে না। সুতরাং নিরবচ্ছিন্ন শক্তি-উৎপাদন হবে না। তা ছাড়া, বায়ুপ্রবাহের গতির দিকও প্রায়ই পরিবর্তিত হ'চ্ছে। আবার বায়ু অত্যন্ত হালকা, তাই বাতচক্র আলোড়নের জন্য প্রচুর পরিমাণ বায়ুর দরকার হয়; এই জন্য উঁচুতে বিশালাকার পাখা দরকার। সেটাকে তৈরী করা এবং স্থিরভাবে রাখা বেশ সুকঠিন ও ব্যয়সাধ্য। তবু আমাদের মত গরীব দেশে যদি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট বাতচক্রের সাহায্যে জলতোলা বা ছোট কল চালানো বা ব্যাটারী চার্জ করাও যায় তবে অনেকটা আর্থিক সুবিধা হবে। এ প্রচেষ্টা করার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়

বায়ুমণ্ডলে জলের পরিমাণ খুব সামান্য নয়, আয়তনের হিসাবে গড়ে বায়ুর শতকরা একভাগেরও বেশী হবে। তবে বিভিন্ন জায়গায় এর পরিমাণ এক নয়।

স্থান, কাল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, উষ্ণতা এ সবের উপর বাতাসে জলের পরিমাণ অবশ্যই নির্ভর করে। রাজপুতানার বাতাস যখন প্রায় একেবারে শুষ্ক ও অনার্দ্র, আসামের পাহাড়ের বাতাস তখন খুবই জলসিক্ত। মোটামুটি একটা হিসেব থেকে দেখা গেছে, সমস্ত বায়ুমণ্ডলের মোট জলের পরিমাণ 0·13 Gg বা 13×10^{15} কিলোগ্রাম (1000 কোটি টনেরও উপরে)।

বাতাসে এই জল আসে সাগর-মহাসাগর, নদী, নালা, হ্রদ, জলাশয়, ভূপৃষ্ঠে যেখানেই জল রয়েছে সেখান থেকে—বাষ্পীভবনের ফলে। ভূতলের প্রায় শতকরা সত্তর ভাগই সাগর আর মহাসাগর। এই বিপুল বারিধি থেকেই বাষ্পীভবন হয় সবচেয়ে বেশী। একথাও সবার জানা, উষ্ণতা যত বেশী হয়, বাষ্পীভবনের কাজটাও হয় তত বেশী। নিরক্ষ-অঞ্চলের সাগর থেকেই তাই বাষ্প আসে সর্ব্বাধিক।

কিন্তু বাতাস যে কোন পরিমাণ বাষ্প ধ'রে রাখতে পারে না, তার একটা সীমা আছে। নির্দিষ্ট কোন উষ্ণতায় বাতাসে যে সর্ব্বাধিক পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকতে পারে সেটা নির্দিষ্ট। তাপমাত্রা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিমাণটা বেড়ে যায়। এই সর্ব্বাধিক পরিমাণ বাষ্প যখন থাকে তখন বাতাস জলীয় বাষ্পে সম্পৃক্ত। বেশী বাষ্প থাকলে, বাতাসকে সম্পৃক্ত ক'রে অতিরিক্ত বাষ্পটুকু ঘনীভূত হ'য়ে জলবিন্দুতে পরিণতি লাভ করে। মনে কর, সম্পৃক্ত হওয়া কোন বাতাসের তাপমাত্রা কোন কারণে কমে গেল। সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য এই ঠাণ্ডা বাতাসের বাষ্পের প্রয়োজন আগের চেয়ে এখন কম। সুতরাং বাতাসে যে বাষ্প ছিল এখন সেটা ওর সম্পৃক্তির পরিমাণের চেয়ে বেশী। এই অতিরিক্ত বাষ্প তখন জলকণাতে পরিণত হবে। এভাবেই শিশিরের জন্ম। দিনে তাপমাত্রা থাকে বেশী। যে পরিমাণ বাষ্প থাকে তাতে হয়ত বাতাস সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু রাতে উষ্ণতা যথেষ্ট নেমে যায়, তখন সেই বাষ্পটুকুই বাতাসকে সম্পৃক্ত ক'রেও বাড়তি হ'য়ে পড়ে। ঘনীভবনের ফলে এই বাড়তি বাষ্প তখন জলের ফোঁটার আকারে ঘাসের পাতায় বা উন্মুক্ত শীতল জিনিষের উপরে শিশির হ'য়ে জমে। ধীর বায়ুপ্রবাহে মেঘমুক্ত আকাশের নীচেই শিশির সহজে পড়ে।

কেটলীর ফুটন্ত জল থেকে অস্বচ্ছ মেঘের মতো ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে দেখি, সেটাও কিন্তু বাষ্প থেকে ঘনীভূত খুব ছোট ছোট জলকণা। যে প্রচুর বাষ্প কেটলীর মুখ থেকে বেরোয় তা সেখানকার বাতাসের সম্পৃক্তির প্রয়োজনের চেয়ে অধিক, তাই খানিকটা সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত হ'য়ে যায়।

বাতাস যদি অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে, তাহ'লে রাত্রিতে ঠাণ্ডা জমির সংস্পর্শে এসে নীচেকার বায়ুস্তর শীতল হ'য়ে পড়ে। সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে বাতাসের বাষ্প ঘনীভূত হ'য়ে প্রচুর সূক্ষ্ম জলকণার সৃষ্টি করে। অনেকটা এলাকা জুড়ে এই জলকণাগুলি বাতাসেই ভাসে—একে বলে কুয়াশা। ফলে বাতাসের স্বচ্ছতা কমে যায়, অনেক সময় কাছের জিনিসও দেখা যায় না। তাপমাত্রা বাড়লে, বা রৌদ্র কিরণে, জলবিন্দুগুলি উড়ে যায় বাষ্প হ'য়ে, আর কুয়াশা লোপ পায়। এ রকম কুয়াশা কয়েক মিটার পুরু হয়।

আবার কখন কখনও গরম আর্দ্রবাতাস যদি ঠাণ্ডা সমুদ্র বা মাটির উপর দিয়ে ব'য়ে যায়, তখনও সম্পৃক্তির ফলে বাতাসের নিম্নস্তরের বাষ্প ঘনীভূত হ'তে থাকে।

ফলে এখানেও কুয়াশার সৃষ্টি হয়। তবে এসব কুয়াশা যোজনব্যাপী হয় এবং উপরের দিকে কয়েকশত মিটার পর্য্যন্ত থাকে। খুব সহজে এই কুয়াশা দূর হয় না। সমুদ্রের শীতল জলপ্রবাহের উপরে এরকম কুয়াশা বেশী দেখা যায়। একে বলে "অ্যাডভেক্‌সন ফগ্‌"।

বাতাসে কতটা বাষ্প আছে সেটা নানারকমের আর্দ্রতামান-যন্ত্র বা হাইগ্রোমিটার দিয়ে সহজেই জানা যায়। প্রতিদিনের কাগজে বিভিন্ন জায়গার বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা দেওয়া থাকে। যেমন, আজকের কাগজে কলকাতার বাতাসের আর্দ্রতা 71%। অর্থাৎ, যে পরিমাণ বাষ্প থাকলে বাতাস সম্পৃক্ত হ'তে পারত, তার শতকরা 71 ভাগ মাত্র রয়েছে।

মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়

বায়ুমন্ডলের জল সবটাই যে বাষ্পাকারে রয়েছে তা নয়, যদিও অধিকাংশই তাই। খানিকটা বাষ্প ঘনীভূত হয়ে সূক্ষ্ম জলকণা ও তুষার-কণা হয়ে থাকে।

বাতাসে যদি যথেষ্ট জলীয় বাষ্প থাকে আর কোন উপায়ে যদি সেই বাতাস ঠান্ডা হ'য়ে পড়ে তবে বাষ্প খানিকটা ঘনীভূত হবে। বাষ্পের ভেতরেই তখন প্রচুর জলকণা এবং অতিরিক্ত শীতল হ'লে এমনকি ছোট্ট ছোট্ট তুষারকণাও তৈরী হবে। এই কণাগুলো এত ছোট আর হাল্‌কা যে সেগুলো বাষ্পের মধ্যেই ভেসে থাকে, থিতিয়ে মাটিতে পড়ে যায় না। জলকণাগুলোর ব্যাস 0·01 মিলিমিটার বা তার চেয়েও কম। এমনি জলকণা, বরফকণা-ভরা বাষ্প যখন বায়ুমন্ডলে কোথাও পুঞ্জীভূত হয় তখন তাকে আমরা বলি মেঘ। ছোট কণা থাকে অসংখ্য, তাই বাতাস সেখানটায় অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে, সেই জন্যেই মেঘকে আমরা দেখতে পাই।

দেখা যাচ্ছে, মেঘ-সৃষ্টির জন্য বাতাসকে শীতল হ'তে হবে, বাষ্প-সম্পৃক্ত হ'তে হবে। প্রশ্ন উঠবে বাতাস কি করে ঠান্ডা হবে। যে সব মেঘ আমরা সর্ব্বদা আকাশে দেখতে পাই, সেগুলো সবই পৃথিবীর কাছের ট্রোপোস্ফিয়ারের মধ্যেই। ভূতল থেকে যত উপরে যাওয়া যাবে চাপ এবং তাপমাত্রা দুটোই কমতে থাকে। বাতাস ঠান্ডা হয় নীচ থেকে উপরে উঠে গিয়ে। তিনটি কারণে বাতাসের উর্ধ্বগতি হ'য়ে থাকে। প্রধানতঃ, ভূপৃষ্ঠ যখন তেতে যায় তখন তার কাছের বাতাসও উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে। তখন এই গরম বাতাস খাড়া উপরের দিকে উঠতে থাকে। চারদিক থেকে অপেক্ষাকৃত কম গরম এবং ভারী বাতাস সেখানে চলে আসে, আবার সেটাও গরম হ'য়ে উপরের উঠতে থাকে। এমনি ক'রে উপরের দিকে বাতাসের একটা প্রবাহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু উপরে চাপ কম, তাই এই উর্ধ্বগতি বাতাস উঁচুতে গিয়ে প্রসারিত হতে থাকে। প্রসারণের ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই বাতাস অনেকটা শীতল হ'য়ে পড়ে, তাছাড়া উপরের তাপমাত্রাও কম। প্রতি কিলোমিটার উঠলে গড়ে তাপমাত্রা 10°C নেমে যায়। উষ্ণতা যথেষ্ট ক'মে গেলে, বাতাস বাষ্প-সম্পৃক্ত হ'য়ে পড়ে আর জলবিন্দুর সৃষ্টি হ'তে থাকে।

অনেক সময় বাতাস জমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'তে গিয়ে কোন পাহাড়-পর্ব্বতে ধাক্কা খায় বা অন্য বাধার সম্মুখীন হয়। তখন বাধ্য হ'য়েই সেই বায়ু-প্রবাহ উপরের

দিকে উঠতে থাকে, ফলে তাপমাত্রা কমে এবং বাষ্প ঘনীভূত হ'তে শুরু করে। এই কারণেই প্রায়ই উপত্যকায় বা পর্বতের সানুদেশে বৃষ্টিপাত দেখতে পাই।

এ ছাড়াও, দু'টি বিভিন্ন উষ্ণতার বায়ুপ্রবাহ যদি এসে পরস্পরের সম্মুখীন হয় তা হ'লে যে প্রবাহটি উষ্ণতর সোট শীতল প্রবাহের উপরে উঠে যায়। তখন উষ্ণ প্রবাহের নীচের দিকের অংশে ঘনীভবন আরম্ভ হয়। এ থেকে প্রায়ই কুয়াশা বা মেঘ অনেকটা অঞ্চল জুড়ে সঞ্জাত হয়।
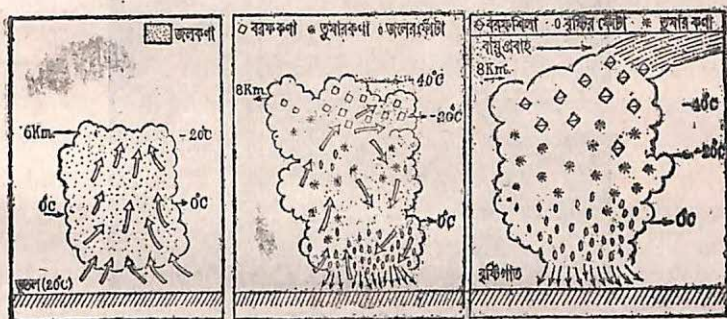
চিত্র ২৭। মেঘ থেকে বৃষ্টি

বাতাস ঠান্ডা হ'য়ে বাষ্প-সম্পৃক্ত হ'লেই তৎক্ষণাৎ জলকণা তৈরী হয় না। এর জন্যে আরও একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন। ঘনীভবনের জন্য কঠিন কণাগুলো ঘনীভবনের কেন্দ্ররূপে কাজ করে। আগেই বলেছি, বাতাসে রয়েছে অসংখ্য অতিসূক্ষ্ম ধূলিকণা। এই কণাগুলোর উপর এসে বাষ্প ঘনীভূত হয় এবং জলকণায় পরিণত হয়। যদি বাতাস ধূলিকণামুক্ত হ'ত তবে তাপমাত্রা অনেক নেমে গেলেও কিন্তু বাষ্পের ঘনীভবন হ'ত না। শুধু ধূলিকণা নয়। সাগর থেকে জল উড়ে যাওয়ার সময় খানিকটা সূক্ষ্ম লবণকণাও বাতাসের উপরের স্তরে গিয়ে হাজির হয়। তাছাড়া নানা কলকারখানা থেকে যে গ্যাস আসে, তার ফলে বাতাসের সালফিউরিক অ্যাসিডের বিন্দুও কিছু থাকে। এ সবই বাষ্পের ঘনীভবনের কেন্দ্র হ'য়ে থাকে। এদের উপরেই জলকণা গড়ে ওঠে।

জলকণাগুলো আবার যদি খুব ঠান্ডা হ'য়ে যায় তবে বরফের কণা তৈরী করতে পারে। সাধারণ অবাস্থয় সবাই জানে যে 0°C তাপমাত্রায় জল জমে বরফ হ'য়ে যায়। কিন্তু জল যখন খুব ছোট্ট ছোট বিন্দু হ'য়ে থাকে তখন 0°C কেন, তার অনেক নীচে গেলেও সহজে জমতে চায় না। শুধু তাই নয়। তুষার-কণা হ'তে হ'লেও জমে যাবার জন্যে কঠিন কেন্দ্র প্রয়োজন হয়। সব কঠিন ধূলিকণাই তুষার তৈরীর কেন্দ্র হয় না, কতকগুলো হ'তে পারে। খুব সামান্য বরফের ছোট্ট কণা কোনরকমে একবার তৈরী হ'য়ে গেলে জল তার ওপর সহজেই স্ফটিকাকারে জমতে পারে। সাধারণতঃ −20°C তাপমাত্রায় তুষারকণার সৃষ্টি হয়। আর তাপমাত্রা যদি −40°C-এ নেমে যায় তাহ'লে জলবিন্দুগুলির প্রায় সমস্তটাই বরফের কণা হ'য়ে পড়ে। ট্রোপোস্ফিয়ারের

উপরের অংশে যে মেঘ থাকে তাতে ভাসমান তুষার-কণাই থাকে, সেখানকার তাপমাত্রা খুবই কম। এই তুষারের ছোট স্ফটিকগুলো নানা বিচিত্র রূপ নিয়ে তৈরী হয়। তার কয়েকটি মাত্র ২৮ নং ছবিতে দেখান হ'ল। সবগুলোতেই ছ'টি কোণ রয়েছে।

চিত্র ২৮। তুষারকণার বিভিন্ন রূপ

এ-ত' হ'ল মেঘের জন্মকথা। মাথার উপরের আকাশকে রূপে বর্ণে অতুল বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে এই মেঘ। যদি আকাশে মেঘ না থাকত সারাক্ষণ আকাশ একমাত্র অসীম নীল হ'য়ে থাকত, বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে হ'ত সমস্ত পরিবেশ। কতরকম সাজ নিয়ে আকাশে মেঘের আবির্ভাব—কখনও 'শুভ্র সমুজ্জল', কখনও ধূসর পাংশুল, কখনও স্বর্ণ কিরীট মাথায়, কখনও ভীষণ 'কুটিল কৃষ্ণকালো'। কখনও সে সারা আকাশ জুড়ে আছে, কখনও এখানে সেখানে স্তূপ হয়ে রয়েছে। কখনও দিগন্তে সব বিরাট ঐরাবত শিশুর মতো দাঁড়িয়ে আছে, আবার কখনও ফুলের ছোট ছোট স্তবকের মতো ঘন নীলিমার বুকে ছড়ানো। মেঘ কখনও নিস্পন্দ নিথর, কখনও ভেসে যায় 'পুঞ্জে পুঞ্জে দূর সুদূরের পানে দলে দলে,' আবার কখনও মত্ত বেগে উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গের মত উদ্দাম হয়ে ছোটে। এমন কোন দেশ নেই, যার কবি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে এই মেঘের রূপ দেখে তার বন্দনা করেননি। 'দিগন্তের তমাল বিপিনে শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর' দেখে কবি রচনা করেছেন অমর কাব্য। রামগিরির নবীন মেঘকে অভিশপ্ত বিরহ-ব্যথাতুর যক্ষ তার অন্তরের অরুন্তুদ মর্মবেদনার কথা সুদূর অলকাপুরীতে তার প্রিয়ার কাছে পৌঁছে দিতে কত আকুতি জানিয়েছিল—মহাকবির সেই বিরহ-গাথা চিরকালের জন্যে অক্ষয় অমর হ'য়ে রয়েছে।

বিজ্ঞানীর মনে কল্পনা-বিলাস নেই—তাঁরা দেখেন মেঘকে অন্য দৃষ্টিতে। তাঁরা বলেন, মেঘগুলো প্রধানতঃ চার রকমের। সবচেয়ে উপরে যে মেঘ থাকে তাকে বলা হয় "অলক মেঘ" (Cirrus Cloud)। হাল্কা সাদা মেঘ আকাশের খুব উপরে প্রায় 20000 ফিট বা তারও বেশী উঁচুতে ভেসে থাকে। এ মেঘ থেকে বৃষ্টি বড়

হয় না। পেঁজা তুলোর মতো বা পাটের আঁশের মতো নীল আকাশে ভেসে থাকে। অলক মেঘ অজস্র তুষারকণা দিয়ে তৈরী, জলকণা বিশেষ নেই। আমাদের দেশে শরতের আকাশে এ মেঘ দেখা দেয়। এ মেঘ শান্ত সুন্দর আবহাওয়ার নির্দ্দেশ দেয়।

প্রচুর জলবাষ্প নিয়ে খুব গরম হাওয়া যখন ঊর্ধ্বগামী হয়, তখন উপরে গিয়ে শীতল হ'লে সেখানে মেঘের সব ঢিপি তৈরী হয়। বড় বড় তুলোর বস্তা বা ছোট ছোট পাহাড়ের মতো আকাশের জায়গায় জায়গায় এই মেঘ পুঞ্জীভূত হয়। একে বলে "স্তূপ মেঘ" (Cumulus Cloud)। নিরক্ষীয় অঞ্চলে এ রকম মেঘ বেশী দেখা যায়। স্তূপ মেঘ থেকে বেশ বৃষ্টি হয়। এ মেঘ থাকে 6000 ফিটেরও উপরে। স্তূপ মেঘে প্রধানতঃ জলকণা থাকে। কখনও কখনও স্তূপমেঘের চুড়ো গিয়ে অলকমেঘের তলার সঙ্গে মিশে যায়, শীতল হওয়ার জন্যে সেই মেঘে যথেষ্ট তুষারকণাও দেখা যায়; একে তখন বলা হয় অলক-স্তূপ মেঘ (Cirro-cumulus)।
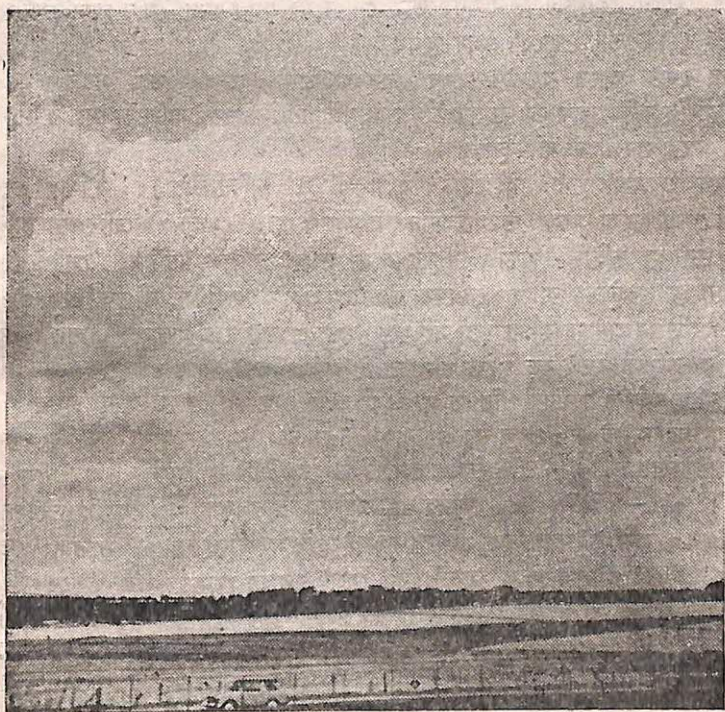
চিত্র ২৯ ক। অলক-স্তূপ মেঘ

কখনও হঠাৎ ঠাণ্ডা বায়ুপ্রবাহে স্তূপ মেঘে অপরিমিত জলকণা সঞ্চিত হ'য়ে যেতে পারে। তখন স্তূপ মেঘ এক গভীর কালো ভারী মেঘে পরিণত হ'য়ে পড়ে। এটা "জলদ মেঘ" (Nimbus)। এই জলদ-স্তূপ মেঘ থেকে খুব প্রবল বর্ষণ হয়। অনেক

সময় শিলাবৃষ্টিও হয়। আমাদের দেশে বর্ষার প্রথম দিকে এমনি ধরনের মেঘ প্রায়ই দেখা যায়।

শীতল আর উষ্ণ বাতাসের সংমিশ্রণের ফলে যখন বাষ্পের ঘনীভবন হয়, তখন অনেক জায়গা জুড়ে মেঘ ছড়িয়ে থাকে। একটা ভারী আচ্ছাদনের মতো অনেকটা আকাশ ঢেকে রাখে। এরা "স্তর মেঘ" (Stratus)। স্তর মেঘ সবচেয়ে নীচের মেঘ —এমনকি দেড় দুই হাজার ফিটেও এই মেঘের চাদর হ'তে পারে। স্তর মেঘ থেকে ধীরে ধীরে ছোট ছোট ফোঁটায় অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি হ'তে থাকে। কখনও স্তূপ মেঘ নীচে নেমে এসে স্তর মেঘের সঙ্গে মিশে একাকার হ'য়ে যায়—তৈরী হয় স্তূপ-স্তর মেঘ (Cumulo-stratus)। শ্রাবণের বারিধারা এই মেঘ থেকেই। স্তর মেঘ উপরে উঠে কুচিৎ অলক-স্তূপের সঙ্গে একত্র হ'য়ে একটা প্রায় স্বচ্ছ হালকা ওড়নার মতো ছড়িয়ে থাকে—এটা অলক-স্তর (Cirro-stratus)। এই অলক-স্তর মেঘের জন্যেই মাঝে মাঝে চাঁদ বা সূর্য্যের চারদিকে উজ্জ্বল গোলাকার বৃত্ত দেখা যায়।

স্তর মেঘের বৈশিষ্ট্য তার ব্যক্তিত্বে, সৌন্দর্য্যে অলক মেঘ, মৌন গাম্ভীর্য্যে স্তূপ মেঘ আর শক্তিমত্তার প্রাচুর্য্যে জলদ মেঘ।

মেঘ থেকে আসে বৃষ্টি। মেঘ বৌদ্ধধর্মাশ্রয়ী ; ত্যাগই তার মর্মকথা। সে বাণী শুনেছি কবিগুরুর উদাত্ত কণ্ঠে, "মেঘ বরিষার/নিজেরে নাশিয়া দেয় বৃষ্টিধার/ সব ধর্ম মাঝে ত্যাগ ধর্ম সার ভুবনে"।

মেঘের জলকণাগুলো খুবই ছোট (ব্যাস = 0·01 মিলিমিটার)। বৃষ্টির জলের সাধারণ ফোঁটাগুলো অন্ততঃ তার চেয়ে দশ লক্ষগুণ বড়। মেঘকণাগুলো থেকে বৃষ্টির ফোঁটা তৈরী হয় দুইটি উপায়ে। যে সব মেঘের তাপমাত্রা খুব নীচু নয়, 0° সেণ্টিগ্রেডের কাছাকাছি বা একটু উপরে, সেখানে ছোট্ট জলকণা অতি ধীরে ধীরে নীচের দিকে পড়তে থাকে এবং তখন অন্যান্য কণার সঙ্গে সংস্পর্শে এসে একত্র হ'তে থাকে। এ রকম একীভবনে কণাগুলো যতই বড় হ'তে থাকে ততই আরও বেশী কণার সঙ্গে ধাক্কা খায়, ফলে শেষ পর্য্যন্ত বৃষ্টির ফোঁটায় পরিণত হয় এবং ভূতলে অধঃক্ষিপ্ত হয় বৃষ্টি রূপে। এ রকম মেঘের বৃষ্টি খুব প্রবল নয় এবং ফোঁটাও ছোট। আবার অনেক সময় স্তূপমেঘে নীচের উষ্ণতা $0°C \sim -5°C$ কিন্তু স্তূপের উপরের উষ্ণতা অনেক কম, মনে কর $-20°C \sim -25°C$। এই মেঘের নীচের দিকে প্রচুর জলকণা থাকে কিন্তু উপরের অংশে থাকে অসংখ্য বরফ-কণা। সব কণাই প্রথমে খুবই ছোট, সুতরাং ভেসে থাকতে পারে। নীচে থেকে বায়ুপ্রবাহ যেই মেঘের ভেতর দিয়ে উপরে উঠতে থাকে (স্তূপ মেঘে তা থাকেই) জলকণাগুলো উপরে উঠে তুষার-কণার সান্নিধ্যে এসে পড়ে। তুষার কণার বাষ্পচাপ জলকণার চেয়ে কম। এর ফলে জলকণাগুলো উদ্বায়িত হ'য়ে গিয়ে তুষার কণার কেলাসে জমতে সুরু করে। তুষার কণাগুলো হ'য়ে যায় অনেকটা ভারী এবং বড় ; সেগুলো তখন নীচে নামতে থাকে। যতই নীচে আসে সেগুলো আরও জলকণার সংস্পর্শে আসে—সেগুলোও জমে যায়। ক্রমশঃ এমনি করে বেশ বড় বড় বরফের টুকরো হয়। এগুলো যখন পড়তে থাকে, তখন আরও নীচে 0°C-এর উপরের উষ্ণতায় এলে গলতে শুরু করে এবং বড় বড় জলের ফোঁটাতে পরিণত হয়। এই জলই বৃষ্টি হয়ে 'নিদাঘ-তাপে তপ্ত ধরায় তৃপ্তি ধারা' হ'য়ে নেমে

আসে। কখনও কখনও ঠাণ্ডার জন্যে মেঘের উপর তলায় বড় বড় বরফের চাঁই জমে যায়। সেগুলো নামবার পথে সবটা হয়ত গলতে পায় না, তাই কোন কোন সময়,

চিত্র ২৯খ। স্তর মেঘ
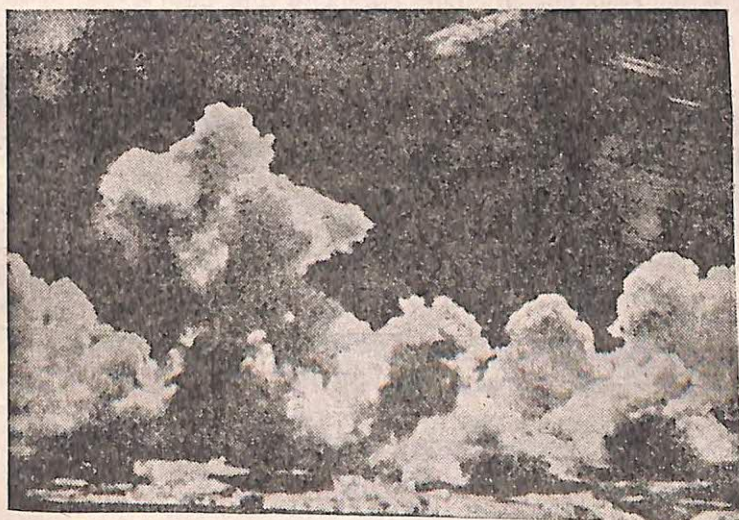
চিত্র ২৯গ। স্তূপ মেঘ

বিশেষ ক'রে হঠাৎ খুব গরম দিনের শেষে বরফের ডেলাও এসে ভূতলে পোঁছয়। আমরা বলি, শিলাবৃষ্টি হচ্ছে।

পৃথিবীর উপর বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ এই বারিধারা। মেঘলোকের এই অকৃপণ বর্ষণ ধরিত্রীকে দিয়েছে তার প্রাণরস, বসুন্ধরা হয়েছে শ্যাম-ছায়া-ঘন সুজলা সুফলা। অরণ্যে, শস্যক্ষেতে, বৃক্ষলতায়, হিল্লোলিত পত্রপল্লবে মুখরিত হ'য়ে উঠেছে জীবনের উল্লাস। তাই কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে,

"—মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি লীলানৃত্যে করেছে বর্ষণ
যৌবন অমৃতরস—তুমি তাই নিলে ভরি ভরি
আপনার পত্রপুষ্পপুটে অনন্ত-যৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা।"

বর্ষণ কিন্তু সবজায়গায় একরকম নয়। কোথাও বৃষ্টির বিরাম নেই আবার কোথাও সারা বছরে একদিনও বৃষ্টির দেখা মেলে না। আসামে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে আর সেই একই অক্ষাংশে রাজস্থান বৃষ্টির অভাবে ধু ধু মরুভূমিতে পরিণত। বারিপাত নির্ভর করে আঞ্চলিক অবস্থান আর নৈসর্গিক অবস্থার উপরে। প্রচুর বাষ্প নিয়ে বাতাস যখন পাহাড়ে ধাক্কা খায়, সানুদেশে বৃষ্টি নামে। বায়ু ক্রমশঃ বাষ্পহীন হ'তে থাকে আর পাহাড় বেয়ে উপরে ওঠে। শিখর পেরিয়ে গিয়ে বাতাস যখন অপর দিকে নামতে থাকে তখন বাতাস শুষ্ক ও বাষ্পহীন, তাই পাহাড়ের অনুবাত দিকে বৃষ্টি নেই। আসামের খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণে আর্দ্র মৌসুমী বায়ুর কল্যাণে চেরাপুঞ্জীতে যখন চারশ' ইঞ্চি বৃষ্টিপাত, পাহাড়ের উত্তরে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে শিলংয়ে (অনুবাত দিকে) বৃষ্টিপাত মাত্র পঞ্চান্ন ইঞ্চি। মহাসাগর থেকে মৌসুমী বায়ু এসে হিমালয়ের বুকে ধাক্কা খায়। পর্ব্বতের দক্ষিণে বাংলা-আসাম অঞ্চলে তাই বৃষ্টি নামে। কিন্তু পর্ব্বতের উত্তর দিকে তিব্বত মালভূমিতে নেই কোন বৃষ্টি। তেমনি আরব সাগরের বায়ু এসে পশ্চিম ঘাটের মালাবার উপকূলে যথেষ্ট বৃষ্টি দেয়। কিন্তু পাহাড় পেরিয়ে যখন সেই বায়ু দাক্ষিণাত্যের উপর দিয়ে যায়, হায়দ্রাবাদ অঞ্চল তখন অতি সামান্যই বৃষ্টি পায়।

বর্ষণের পরিমাণ আমরা জানতে পারি নানারকম বৃষ্টি-পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে। কোন অঞ্চলের বারিপাত ইঞ্চিতে বা মিলিমিটারে মাপা হয়। সমস্তটা বৃষ্টি যদি সেই অঞ্চলে একত্র জমা করা যেত, জমিতে যদি শোষণ না হ'ত বা বাষ্প হয়ে উড়ে না যেত কিংবা নদী নালায় চলে না যেত, তা হ'লে সেই জলের উচ্চতা যা হ'ত সেটাই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ।

বৃষ্টির সময় একটি নির্দিষ্ট আকারের বোতলে একটা ফানেলের সাহায্যে জল সংগ্রহ করা হয়। বিজ্ঞানীরা সেই জলের পরিমাপ ক'রে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ণয় করেন। এই যন্ত্রকে বলা হয় রেন-গেজ (Rain gauze), বৃষ্টি-পরিমাপক যন্ত্র।

পৃথিবীর সর্ব্বাধিক বৃষ্টি দেখা গেছে আসামের খাসিয়া পাহাড়ের চেরাপুঞ্জী অঞ্চলে। সেখানে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 500 ইঞ্চিরও উপরে। এমনকি, এক বছর (1860 – 1861) সেখানে অসম্ভব বৃষ্টি হয়েছিল, 1041·8 ইঞ্চি। আর সবচেয়ে কম বৃষ্টি হয় সাহারা আর গোবি মরুভূমিতে। অনেক সময় সেখানে পরপর কয়েকবছর একেবারেই কোন বৃষ্টি হয় না। স্বল্প সময়ে প্রবল বর্ষণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে, তার কয়েকটা দেওয়া হ'ল।

প্রবল বারিপাত

স্থান	তারিখ	বৃষ্টির সময়	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (ইঞ্চিতে)
পোর্টোবেলো, পানামা	29.11.11	5 মিনিট	2·48
প্লাম্ব পয়েণ্ট, জামাইকা	12.5.16	15 মিনিট	7·80
বেলোভে, রিউনিয়ন দ্বীপ	28.2.64	12 ঘণ্টা	52·76
সিলাও, রিউনিয়ন দ্বীপ	15.3.52	24 ঘণ্টা	73·62
চেরাপুঞ্জী, আসাম	জুলাই, 1861	31 দিন	366·10

কোন জায়গার বৃষ্টি সারাবছর সমানভাবে না হওয়াই সম্ভব। বাংলাদেশে সব চেয়ে বেশী বৃষ্টি হয় আষাঢ় থেকে আশ্বিনের মধ্যে, অন্য ঋতুতে বৃষ্টি অনেক কম। তাই বর্ষাকালে হয় খারিফ শস্যের ফলন, আর শীতের সময় রবিশস্যের চাষ। বর্ষণ যে শুধু স্থানীয় জলবায়ু এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত করে তা নয়। দেশের কৃষিজ উৎপাদন, কর্মপ্রচেষ্টা এবং আর্থিক ব্যবস্থার উপরেও তার বিশেষ প্রভাব থাকে। এলাহাবাদ আর ওয়াশিংটনের বাৎসরিক বারিপাত একই রকম, 41.0 ইঞ্চি। কিন্তু ওয়াশিংটনে বছরের বারমাসই প্রায় একই পরিমাণ বৃষ্টি হয়, আর এলাহাবাদে সেই বৃষ্টির প্রায় সবটাই হয় শ্রাবণ থেকে আশ্বিনের মধ্যে, বছরের বাকী সময়ে বৃষ্টি নেই বললেই চলে (চিত্র ৩০)।

বেশ কিছুদিন ধরে অবিশ্রাম প্রবল বর্ষণ হ'লে, সেখানকার নদীনালা সেই প্রচুর জল তাড়াতাড়ি ব'য়ে নিয়ে যেতে পারে না, তখন আশেপাশের দেশ প্লাবিত হয়ে যায় নেমে আসে প্রবল বন্যা। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি অসামান্য—ভয়াবহ। 1968-র জলপাইগুড়ির হঠাৎ প্লাবনের কথা সদ্য মনে পড়বে অনেকের। মুহূর্তের মধ্যে কত মানুষ জীবজন্তু, বাড়ীঘর নিঃশেষ হ'য়ে গেল। 1931 খৃস্টাব্দে উত্তরবঙ্গের প্রবল বন্যাও হয়েছিল প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত থেকে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অক্লান্ত মানবসেবার কথা সেই সূত্রে মনে পড়ে—সেদিন জন্ম নিয়েছিল বাংলার সঙ্কট-ত্রাণ সমিতি।
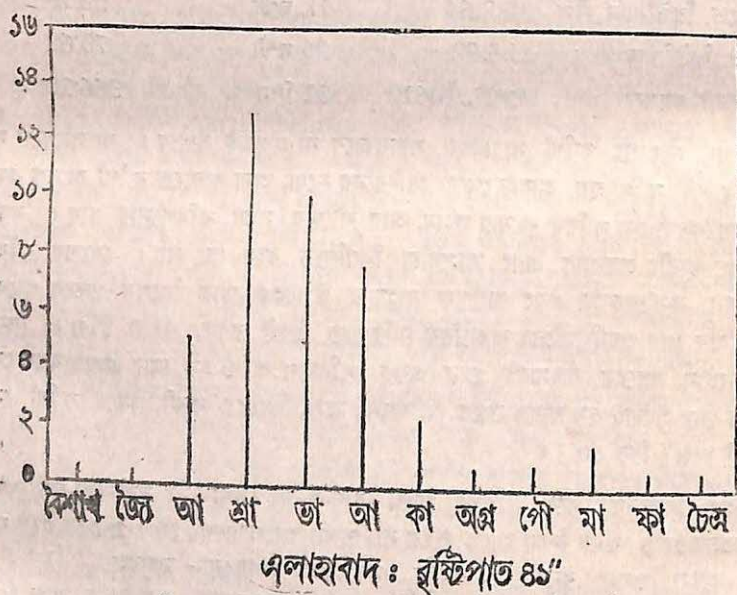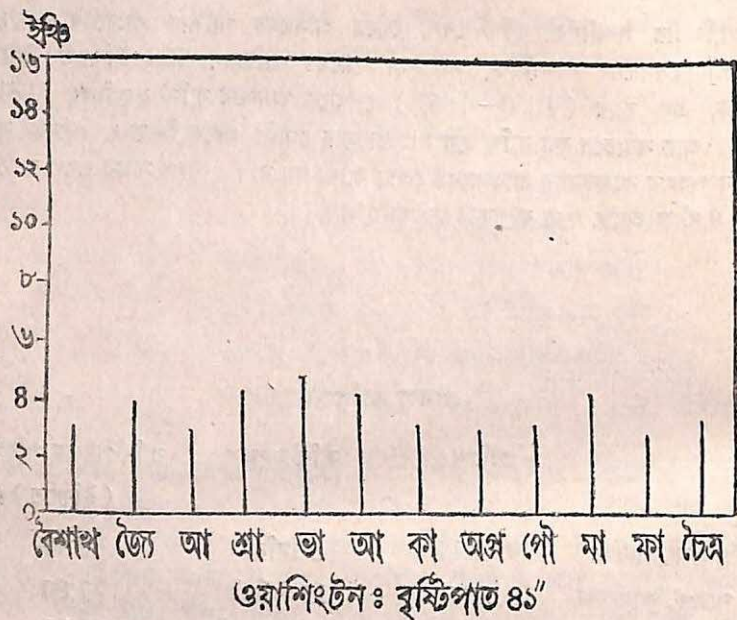
চিত্র ৩০। এলাহাবাদ ও ওয়াশিংটনের বারিপাতের তুলনা

আচার্য্যদেব বাংলার তরুণদের পরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। শুধু ভারতে নয়, ইউরোপ আমেরিকাতেও এরকম অনেক বন্যার ইতিহাস আছে। 1951-এ আল্পসের উপর প্রবল বারিপাতের ফলে ইতালীতে এক ভীষণ বন্যা নেমেছিল। সেই বছরেই মিসিসিপির উপত্যকায় প্রচণ্ড বর্ষণের ফলে এক বিরাট প্লাবনে মহাক্ষতি হয়েছিল।

বৃষ্টির সঙ্গে কখনও আবার অন্যান্য জিনিষ পড়তে দেখা যায়। একবার Aix সহরে (1608) রক্তিম বৃষ্টিধারা পড়েছিল। ভয় পেয়ে লোকে মনে করেছিল রুধির-পাত হচ্ছে। সম্ভবতঃ সমুদ্র থেকে বায়ু-প্রবাহে খুব ছোট্ট ছোট্ট লাল শৈবাল-দল উপরে উঠে গিয়েছিল, বৃষ্টির সঙ্গে সেগুলো নেমে এসেছিল। 1903 সালে সাহারার সূক্ষ্ম লাল বালুকণা উড়ে এসে বৃষ্টির সঙ্গে দক্ষিণ ইংলণ্ডে বর্ষিত হয়েছিল। খুব ছোট ছোট ব্যাঙাচি বা মাছ অনেক সময় বৃষ্টির সঙ্গে পড়তে দেখা যায়, কারণটা একই।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সমুদ্র উপকূল থেকে দূরে বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়া বা আফ্রিকার অভ্যন্তরে অনেক দেশ আছে, যার বৃষ্টিপাত অনেক কম। মরুসন্নিহিত অঞ্চলেও তাই। অনাবৃষ্টির জন্য এসব দেশে শস্যের ফলন কম। এখানকার বাতাসে বা মেঘে যে জলীয় বাষ্প বা জলকণা আছে সেটা তুষার-কণায় পরিণত না হওয়ার ফলে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কোনরকমে যদি সেখানকার মেঘে কৃত্রিম উপায়ে তুষার কণার সৃষ্টি করা যায় তা হ'লে বৃষ্টিপাত হ'তে পারে। আমেরিকান বিজ্ঞানী শেফার (Schaefer, 1946) এটা প্রথম ক'রতে সক্ষম হন। তিনি প্লেনে ক'রে উঠে 14000 ফিট উপরে একটি মেঘের মধ্যে ছয় পাউন্ড "শুকনো-বরফ" (dry ice, solid carbon dioxide) ছড়িয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে এই শুকনো-বরফের উপর জল জমে গিয়ে তুষার-খণ্ডের সৃষ্টি হ'য়ে গেল। এর পরের বছর (Feb 5, 1947) অস্ট্রেলিয়ার সিডনীর কাছে এক স্তূপ মেঘের অভ্যন্তরে সেই শুকনো বরফের বীজ বপন ক'রে দিলে, কুড়ি মিনিটের মধ্যে সমস্ত অঞ্চল ধরে প্রচুর বারিপাত হ'ল। পরে বৃটেনে ও অন্যান্য দেশেও এরকম কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটানো হয়েছে। অনাবৃষ্টি হ'লে এমনি ক'রে যদি কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টির সৃষ্টি করা যায়, নিঃসন্দেহে সেটা আশার ও মঙ্গলের কথা।

কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগের কিছু কুফলও থাকে; যেমন পারমাণবিক বিভাজনে। এখানেও দেখা যায়, একটি শুকনো-বরফের টুকরো ঘন মেঘের ভেতর দিয়ে ছুটে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার টন তুষারকণা মুহূর্তে তৈরী হ'য়ে যায়। ছঠাৎ একটা জলীয় বাষ্প বা জলকণা ঘনীভবনের ফলে প্রচণ্ড তাপের উদ্ভব হবেই এবং তাতে স্থানীয় অঞ্চলের বায়ুমন্ডল খুবই উত্তপ্ত হ'য়ে উঠবে। জলবায়ুর উপর তার প্রভাব অনুকূল নাও হ'তে পারে, তাছাড়া ঝড়-ঝঞ্ঝার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা দেবে।

আর একটা অপপ্রয়োগের সম্ভাবনাও কল্পনা করা যেতে পারে। মৌসুমী বায়ু এসে আমাদের দেশে বৃষ্টিপাত ঘটায়, তা থেকেই আমাদের শস্যসম্পদ। যদি আমাদের কোন শত্রুপক্ষ মৌসুমী বায়ু আমাদের উপকূলে পৌঁছানোর আগেই কৃত্রিম উপায়ে তার

থেকে বৃষ্টিপাত করিয়ে দেয়— তাহ'লে ত সেই বায়ু থেকে আর বৃষ্টি পাওয়া যাবে না ! জমি অনুর্বরা হয়ে দুর্ভিক্ষ ডেকে আনবে। এটা একটা কল্পনা বটে, তবে এরকম সম্ভাবনা কি নেই ?

বৃষ্টির পরে বা অনেক সময় মেঘ-ভরা আকাশে রামধনু উঠতে দেখা যায়। সূর্য্যের সাদা আলো যদি একটা কাচের প্রিজমের মধ্যে দিয়ে চলে আসে তাহলে সেই আলো বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায় সাতটা বিভিন্ন রঙে, এটা সকলেই জানেন। সূর্য্যের আলো এই সাতটা রঙের আলোক তরঙ্গের মিশ্রণ, তাই সাদা। কাচের প্রিজমে ঢুকলে বিভিন্ন তরঙ্গের প্রতিসরণ বিভিন্ন থাকার জন্যে সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে সরে সরে যায়। অর্থাৎ সাদা আলো বিশ্লেষিত হ'য়ে পড়ে। সূর্য্যের আলো তার ভেতর দিয়ে গিয়ে সাতরঙে বিশ্লেষিত হ'য়ে যায়, সেই আলো রামধনু হ'য়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে।

পরিষ্কার আকাশে বায়ু বিশেষ করে নীল আলোটাকে আলাদা ক'রে বিচ্ছুরিত ক'রে দেয়, সেইজন্যেই আকাশের রঙ নীল। এই বিচ্ছুরিত নীল রঙের জন্যে দূরের গ্রহ-নক্ষত্রকে আমরা দেখতে পাই না। অনেক উপরে বায়ুমণ্ডলের বাইরে গেলে, বিচ্ছুরণের সম্ভাবনা নেই, সুতরাং দিনের বেলাতেও মাথার উপরের আকাশ ঘনকালো, গ্রহ-নক্ষত্র সবই দেখা যায়। মহাকাশযাত্রীরা তা প্রত্যক্ষ করেছেন।

মেঘের বিষয়ে আর একটি কথা এ পর্যন্ত বলা হয়নি। মেঘের আধারে সমাহিত হ'য়ে থাকে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি। বড় রকমের ঝড় বাদলের আগে তার প্রকাশ দেখতে পাই উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-চমকে আর দিগন্তব্যাপী তড়িৎ-মোক্ষণে। ভীষণ অথচ অপরূপ সুন্দর। সঙ্গে থাকে ভৈরব নিনাদ—বজ্র-নির্ঘোষ।

বজ্র-বিদ্যুতের সমারোহ সাধারণতঃ স্তূপ মেঘেই হ'য়ে থাকে। বাষ্প-ভারাক্রান্ত উষ্ণ বাতাস অনেক সময় খুব দ্রুত খাড়া উপরে উঠে যায়। এই বাতাসের ঊর্ধ্বগতি খুবই বেশী, কখন কখনও সেকেণ্ডে 30 মিটারও হ'তে পারে। উপরে উঠলে ঠাণ্ডায় বাষ্প ঘনীভূত হ'তে শুরু করে। 2-3 কিলোমিটার উঠে গেলে উষ্ণতা নেমে যায় $0^\circ \sim -20^\circ$C-এ, মেঘের নীচের দিকটাতে তখন প্রচুর জলকণা আর তুষারকণা দেখা দেয়, আরও উপরের মেঘে, -40°C তাপমাত্রায় ছোট ছোট বরফের কণা তৈরী হয়। এ ধরণের প্রক্রিয়া চলতে থাকে প্রত্যেক স্তূপ মেঘেই। অনেক সময় অনেকগুলো এরকম মেঘের স্তূপ একত্র এসে পুঞ্জীভূত হয়। দূর থেকে তাকালে দেখা যায়, একটা স্তূপ ফুলে ফুলে উপরে উঠছে এবং উপরে গিয়ে ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আবার তারপাশেই অপর স্তূপ 'কেশর ফোলা সিংহের' মত ফুলে ফুলে উঠছে এবং ভেঙে যাচ্ছে ; উত্তাল স্তূপ-তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে। ঝড়ের আগে এরকম অনেক স্তূপ এসে জড় হয়। সমস্ত মিলে একটা বিশালকায় গাঢ় ঘন কালো জলদ-স্তূপ মেঘের সাম্রাজ্য গ'ড়ে ওঠে। এই মেঘ প্রায় 8-10 কিলোমিটার জুড়ে থাকে আর উপরের দিকেও সেই রকম 8-10 কিলোমিটার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হ'য়ে থাকে। উপরে যদি বায়ু-প্রবাহ ব'য় তাহ'লে সেই জলদ-স্তূপও তার সঙ্গে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে চলে (চিত্র ৩১)। বাষ্প যথেষ্ট পরিমাণে ঘনীভূত আর হিমায়িত হ'লে এ রকম জলদ-স্তূপে বিদ্যুৎ-মোক্ষণ ঘটে আর মাটির ওপর বিদ্যুৎ-সম্পাত হয়। তখন তড়িৎ-চমক দেখতে পাই আর তার বজ্রনাদ শুনতে পাই। মনে হয় সেই ভীষণ

মেঘ 'কালো শ্যেনপাখীর মতো বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে' যাচ্ছে। এ সময় বরফ আর তুষার কণা আর তার সঙ্গে জলকণা সবেগে নীচের দিকে নামতে থাকে। 0°C-এর উপরে এসে মেঘের নীচ থেকে বৃষ্টির ধারা পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে। এই হ'ল বজ্রঝঞ্ঝার মোটামুটি চিত্র।

চিত্র ৩১। বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ জলদ স্তূপমেঘ

কিন্তু বিদ্যুৎ-মোক্ষণের কারণ কি? মেঘের ভেতরে বিদ্যুৎ-সঞ্চার ঠিক কি ক'রে ঘটে তার খুব সদুত্তর দেওয়া কঠিন। এ সম্পর্কে অনেক রকমের মতবাদ গড়ে উঠেছে। এ রকম একটা মতবাদ সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। মেঘের অভ্যন্তরে বড় বড় জলের ফোঁটাগুলো, যা থেকে বৃষ্টি তৈরী হয়, আর বরফখণ্ডগুলো ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-আহিত থাকে। আর তাদের চারদিকের ছোট ছোট জলকণাগুলোতে এবং পারিপার্শ্বিক বাতাসে থাকে ধনাত্মক বিদ্যুৎ। ঋণাত্মক কণাগুলো ভারী এবং বড় তাই মেঘের নীচের দিকে থাকে। আর অনেক হাল্‌কা ধনাত্মক জলকণা (বা তুষার কণা) উপরের দিকে চলে যায়। সূক্ষ্ম জলকণাগুলোর হিমায়ন, জলকণা ও তুষার কণার সংঘর্ষণ ও সম্মিলন, এই সব প্রক্রিয়া থেকেই বিদ্যুৎ-সৃষ্টি প্রধানতঃ হ'য়ে থাকে। ফল কথা, জলদ-স্তূপের উপরের অংশটা ধনাত্মক এবং নীচের দিকটা ঋণাত্মক। অর্থাৎ মেঘের বিভিন্ন অংশের তাড়িত-বৈভব বিভিন্ন এবং সুযোগ পেলেই এই বিপরীত বৈদ্যুতিক আধানের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মেই প্রশমন ঘটে এবং তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎ-মোক্ষণ হয়ে থাকে। সেই মোক্ষণই বিজলীচমক। কখনও জলের বড় ফোঁটাগুলো বাতাসের ধাক্কায় ভেঙে যেতে পারে। তখন তার থেকে যে সব খুব ছোট

ফোঁটা তৈরী হয় সেগুলো ঋণাত্মকই থেকে যায়, কিন্তু ফোঁটার মাঝখানের বড় অংশটা ধনাত্মক এবং ভারী বলে নীচের দিকে যেতে থাকে। সেইজন্যে কখনও কখনও মেঘের নীচের প্রান্তেও কিছু পরা-বিদ্যুৎ দেখা যায় (চিত্র ৩২)।

স্তূপ-মেঘ যদি মাটির কাছাকাছি থাকে তাহ'লে তখন মেঘের বিদ্যুৎ-আধান এবং মাটির মধ্যেই মোক্ষণ হয় অর্থাৎ বজ্রসম্পাত ঘটে। কিন্তু মেঘ যদি মাটি থেকে অনেক উপরে থাকে তবে মেঘের অভ্যন্তরে বিপরীত আধানের মধ্যেই বিদ্যুৎ-মোক্ষণ হয়।
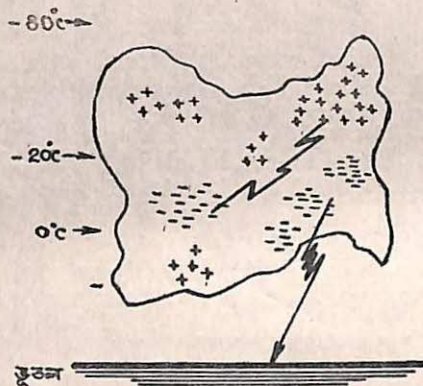
চিত্র ৩২। মেঘে বৈদ্যুতিক আধানের সমাবেশ

বিদ্যুৎ-মোক্ষণ বিপরীত তড়িৎবিভরের মধ্যে সংঘটিত হয়। এই ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক বিভবের মধ্যে ব্যবধান যত বেশী, মোক্ষণও তত তীব্র হয়। মেঘের ভিতরে প্রতি সেন্টিমিটার উচ্চতার ব্যবধানে বিভব 1000 ভোল্টেরও বেশী বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু মোক্ষণ হয় অতি দ্রুততার সঙ্গে। যদিও সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ-সম্পাত হ'তে প্রায় এক সেকেণ্ড সময় লাগতে পারে, কিন্তু প্রধান তড়িৎ-প্রবাহটা 1/10,000 সেকেণ্ডের মধ্যেই চলে যায়। ফলে, মোট যে তড়িৎ-প্রবাহ বিদ্যুৎ-মোক্ষণে পরিচালিত হয় তার পরিমাণ 10,000 থেকে 1,00,000 আম্পিয়ার হয়ে থাকে। মাটির উপরে যে বজ্রসম্পাত হয় তাতে বিদ্যুৎ বৈভবের ব্যবধান এমনকি 1,00.000,000, ভোল্টও হ'তে পারে। একটা সাধারণ আকারের বজ্রঝঞ্ঝা থেকে যে বিদ্যুৎ-শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটে সেটা মানুষের তৈরী বড় বড় বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রের ক্ষমতার চেয়েও বেশী।

আমরা দেখতে পাই শাখাপ্রশাখা-সম্বলিত একটা বিজলী-সম্পাত। কিন্তু আজকাল বিশেষ ক্যামেরার সাহায্যে বিদ্যুৎ-মোক্ষণের ছবি তুলে সরাসরি প্রমাণ করা গেছে, প্রতিটি বিদ্যুৎ-চমক শত শত ছোট ছোট বিদ্যুৎক্ষরণের সমষ্টি। ওদের ভেতর সময়ের ব্যবধান এত কম যে আমাদের চোখে তাদের পৃথক অস্তিত্ব ধরা পড়ে না, সবগুলো একাকার হ'য়ে একটা শাখা প্রশাখাযুক্ত মোক্ষণ দেখা যায়। বজ্রসম্পাতে প্রথমে মেঘ থেকে অপেক্ষাকৃত ধীরগামী একটা মোক্ষণ মাটির দিকে আসে। পথ তৈরী হ'য়ে গেলেই তার পেছনে আসে বড় একটা প্রধান মোক্ষণ পৃথিবীতে। সঙ্গে সঙ্গেই আবার সেই পথেই

বিপরীত দিকে মাটি থেকে মেঘে উজ্জ্বল তড়িৎ-মোক্ষণ ছুটে আসে। এই রকম আসা যাওয়া, অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু বহুবার ঘটে।

বিদ্যুৎ-মোক্ষণ যে পথে যায় সেখানকার তাপমাত্রা খুব বেড়ে যায়। সেখানে বাতাস হঠাৎ প্রসারিত হ'য়ে পড়ে এবং অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করে। এর ফলে বাতাসে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। তাই বিদ্যুৎ-স্ফুরণের একটু পরেই বজ্রনাদ শুনতে পাই। যদিও একই সঙ্গে মোক্ষণ এবং শব্দ-তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, কিন্তু আলোর গতি সেকেণ্ডে 300,000,000 মিটার আর শব্দের গতি সেকেণ্ডে 330 মিটার। এই জন্য শব্দ অনেকটা পরে এসে আমাদের কাছে পেঁছয়। মাটির সঙ্গে মোক্ষণ হলে শব্দটা খুব তীব্র হয়, অর্থাৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব কম থাকে, সেই জন্য এই শব্দ খুব বেশী দূরে পর্য্যন্ত যায় না। কিন্তু মেঘের ভিতরের মোক্ষণের শব্দ গুর গুর করে বেশ কয়েক সেকেণ্ড মন্দ্রিত হ'তে থাকে। কারণ মোক্ষণ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হ'তে হ'তে চলে, তাই বিভিন্ন দূরত্ব থেকে বাতাস মথিত করে শব্দ পর পর এসে কানে পেঁছুতে থাকে।

মাটির সঙ্গে অশনি-সম্পাতের সময় পথে ঘরবাড়ী গাছপালা যা পড়ে সবই ধ্বংস হয়ে যায়, মানুষ বা জীবজন্তুর ত' কথাই নেই। অনেক সময় বজ্রপাত থেকে বড় রকমের অগ্নিকাণ্ডও ঘটে। কিন্তু বিদ্যুৎ-মোক্ষণ থেকে আর একটা মহৎ লাভও হয়। বায়ুমণ্ডলে সর্ব্বদাই কোথাও না কোথাও বিদ্যুৎ-মোক্ষণ চলছে। গিস্ (Gish, 1951) একটা হিসেব করে দেখিয়েছেন যেকোন সময়ে সমস্ত বায়ুমণ্ডলের মধ্যেই নানা কেন্দ্রে তিন থেকে ছয় হাজার বজ্র-বিদ্যুৎ মোক্ষণ চলছে। এই মোক্ষণের ফলে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে শেষ পর্যন্ত নাইট্রেটে পরিণত হচ্ছে। এই নাইট্রেটের ওপর সমস্ত জীবজগৎ যে নির্ভর ক'রে থাকে, সে কথা আগেই আলোচনা করেছি।

আর একটা কথা। ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে যাওয়া যাবে তাড়িত বৈভব তত বাড়বে। মাটি থেকে ছ'ফুট উপরে গেলে তাড়িত বৈভবের ব্যবধান হবে প্রায় 200 ভোল্ট। কিন্তু এতটা ব্যবধান সত্ত্বেও কোন বিদ্যুৎ-মোক্ষণ দেখতে পাই না তার কারণ বাতাসের তড়িৎবাহিতা খুব কম। বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে উঁচু স্তর আয়নোস্ফিয়ার। সেখানে বায়ুর অণুগুলি আয়নিত হয়ে আছে, সুতরাং তার আধান যথেষ্ট এবং সে স্তর খুবই বিদ্যুৎবাহী। আয়নোস্ফিয়ারের বৈভব ভূপৃষ্ঠের চেয়ে অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ ভোল্ট বেশী। এই আয়নোস্ফিয়ার আর ভূতলের মধ্যে রয়েছে ট্রোপোস্ফিয়ার বায়ুস্তর, যার বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা খুবই কম। হিসেব নিয়ে দেখা গেছে, স্বল্প-পরিবাহী হলেও এই বায়ুস্তরের ভেতর দিয়ে সারা ভূপৃষ্ঠে অন্ততঃ 1800 অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ-প্রবাহ চলে আসে। যদি এটা কিছুক্ষণ চলে তবে অল্পক্ষণেই সমস্ত বায়ুমণ্ডল তড়িৎ-উদাসী হয়ে পড়বে এবং তাড়িত বৈভবের পার্থক্য থাকবে না। এই জন্যে আয়নোস্ফিয়ারের বিদ্যুৎ-আধানের পরিপূরণ প্রয়োজন। এই পরিপূরণ হচ্ছে মেঘের নিরন্তর বিদ্যুৎ-মোক্ষণ থেকে। বিদ্যুৎ-মোক্ষণের এটা আর এক অবদান।

বিদ্যুৎ-ভরা মেঘ আর বজ্রসম্পাতের সঙ্গে এসে প্রায়ই মিশতে দেখা যায় ঝ'ড়ো-হাওয়াকে। দু'য়ে মিলে সৃষ্টি করে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত। ঝড়ের উৎপত্তির কারণটা কিন্তু স্বতন্ত্র।

বড় রকমের ঝড়ঝঞ্ঝাগুলো প্রধানতঃ দেখা দেয় নিরক্ষীয় অঞ্চলে বিষুবরেখার কাছাকাছি। ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর আর আতলান্তিক মহাসাগরে বিষুব-রেখার কাছে অনেক ছোট ছোট দ্বীপ রয়েছে, গ্রীষ্মকালে প্রখর তাপে দ্বীপগুলো খুব তেতে যায়, কিন্তু চারদিকের সমুদ্রের তাপমাত্রা খুব বেশী বাড়ে না। দ্বীপগুলোর বাতাস গরম হ'য়ে উপরে উঠে যায় এবং সেখানে "নিম্নচাপের" সৃষ্টি হয়। নিম্নচাপকে ইংরেজীতে বলে depression। চারদিকের বাতাসের চাপ বেশী। সেই বাতাস নিম্ন-চাপ কেন্দ্রের দিকে জোরে ছুটে আস্‌তে থাকে। এই নিম্নচাপ কেন্দ্র প্রায়ই অনেকটা প্রশস্ত, তার ব্যাস অনেক সময়েই 300-400 মাইলও হয়। পারিপার্শ্বিক বাতাস যখন কেন্দ্রের দিকে আসে, তখন সোজা আসে না, পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য (Coriolis নিয়ম অনুযায়ী) ঘুরতে ঘুরতে কেন্দ্রের দিকে যায়। এই বাতাস কেন্দ্রে পৌঁছুলে, সেটাও আবার উপরে উঠতে থাকে। কেন্দ্র থেকে দূরত্ব যতটা বাড়বে বাতাসের চাপও তত বেশী হবে। বাতাসের এই ঘূর্ণন-গতি উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার গতির বিপরীত, আর দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার গতির মতোই। সমচাপের বায়ুপ্রবাহগুলি প্রায় চাকের মতো ঘুরতে ঘুরতে এসে কেন্দ্রে উপস্থিত হয় (চিত্র ৩৩)। এই জন্যেই এদের নাম ঘূর্ণবাত বা সাইক্লোন (Cyclones)। কোন কোন সময় একটা বড় ঘূর্ণবাত ভেঙে গিয়ে কয়েকটা ছোট ঘূর্ণবাতও হ'য়ে থাকে। এই বায়ুতে এমনিও প্রচুর বাষ্প থাকে। কয়েক শত মিটার উপরে উঠলে ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং বড় বড় জলদ-স্তূপ মেঘের সঙ্গে সংহত হয়। বাষ্প সম্পৃক্ত হ'য়ে যাওয়াতে, প্রচণ্ড বর্ষণ এবং ঝড় হয়। ঘূর্ণবাতের কেন্দ্র কিন্তু এক জায়গায় স্থির হ'য়ে থাকে না, কেন্দ্রসহ সম্পূর্ণ সাইক্লোন এগোতে থাকে ঘণ্টায় 10~20 মাইল বেগে। কিন্তু ঘূর্ণবাতের ভিতরে বাতাসের ঘূর্ণনগতি ভীষণ, ঘন্টায় 75 মাইল ত' বটেই, সময় সময় তার চেয়েও অনেক বেশী হ'তে পারে। 1896 সালে সেন্ট লুইসে যে ঝড় এসেছিল, তার বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘন্টায় 558 মাইল। ঘূর্ণবাত যখন সমুদ্র-উপকূলের স্থলভাগে এসে পোঁছয় তখন সেখানে ঝড়ের বেগে প্রচন্ড ধ্বংস অনিবার্য্য হ'য়ে পড়ে।

ঘূর্ণবাত বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কাছের ঘূর্ণবাতকে বলা হয় "হ্যারিকেন" (Hurricanes)। আবার চীনসমুদ্রের ঘূর্ণবাতকে "টাইফুন" (Typhoon) বলা হয়। ভারত মহাসাগরের ঘূর্ণবাত কেবল "সাইক্লোন" নামেই প্রসিদ্ধ। সাইক্লোন স্থলভাগের উপরে ব'য়ে যাবার সময় বাধা পায়, তখন প্রচন্ড বেগে বাতাস এলোপাথাড়ি হ'য়ে নানা দিকে ছুটে চলে। সেই জন্যে ঠিক ঝড়ের মধ্যে থাকলে সবদিক থেকেই ঝড় এসে ধাক্কা দিচ্ছে মনে হয়। কিন্তু পুরোপুরি সম্পূর্ণ সাইক্লোনটা একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে বইতে থাকে।

ঝড়ের তাণ্ডব আর ধ্বংসলীলা ভয়াবহ। এর ধ্বংস-কাহিনীর ইতিহাস বলে শেষ করা যাবে না। 1807-এ বঙ্গোপসাগর থেকে যে ঝড় এসে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ব'য়ে গিয়েছিল তা'তে 90 হাজারেরও বেশী লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল, অসংখ্য ঘরবাড়ী নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছিল। এখনও প্রায় প্রতি বছরেই প্রচন্ড ঝড়ে মাদ্রাজ ও অন্ধ্রের উপকূল, রামেশ্বর সেতুবন্ধ বিধ্বস্ত হ'য়ে থাকে। 1931-এ হন্ডুরাসে এক প্রবল

ঘূর্ণবাত, আধঘন্টার মধ্যে সহস্র সহস্র বাড়ী গির্জা সব ভেঙে শুইয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সমুদ্রতীর থেকে দু'শ টনের একটা মাটিকাটা ড্রেজারকে তুলে নিয়ে অনেকটা দূরে একটা বাড়ীর ছাদে রেখে দিয়েছিল। 1954 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে জাপানের উপকূলে এক মারাত্মক ঝঞ্ঝার আক্রমণ হয়েছিল। তার দৌরাত্ম্যে হাজার হাজার বাড়ী, কারখানা
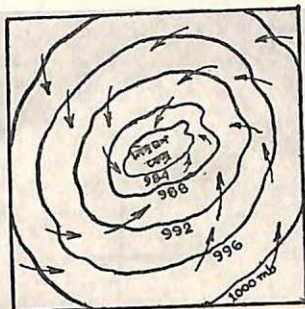
চিত্র ৩৩। ঘূর্ণবাত (উত্তর গোলার্ধ)

ধূলিসাৎ হয়ে যায় এবং অভাবনীয় ধ্বংস-ক্ষতি হয়। মেক্সিকো এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঞ্চলে প্রায়ই হ্যারিকেন বিরাট ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে (1926, 1935)। ঝড়ের তাণ্ডব ত' রয়েছেই, তার সংগে আসে সমুদ্র থেকে বিশাল ঢেউয়ের প্লাবন, সমস্ত উপকূল ভাসিয়ে নিয়ে চলে। ক্ষয়ক্ষতিটা তা'তে সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

ঝড় যখন ফেনিল উন্মত্ততায় অন্ধবেগে প্রলয়-নৃত্যে শুরু করে, তখন তার কাছ থেকে রক্ষা পাওয়া দুরূহ। ঝড়-তুফানকে দমন করা বা নিয়ন্ত্রণ করা সাধ্যের অতীত। তবুও নৈসর্গিক এই দুর্যোগের উৎপত্তি ও আগমনের সঠিক সম্ভাবনা জানা থাকলে অনেকটা সাবধান হ'তে পারা যায় এবং ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাটা কমানো যায়। আজকাল আবহবিদরা বেলুন, যন্ত্রযুক্ত উড়োজাহাজ, রেডিয়োসন্ডে, রাডার প্রভৃতির সাহায্যে, কোথায় নিম্নচাপ সৃষ্টি হ'চ্ছে, কত জোরে বাতাস কোনদিকে বইছে, এসব সংবাদ আগেই সংগ্রহ ক'রে সাবধান ক'রে দেন, তাই খানিকটা রক্ষা। সমুদ্রপোত আর উড়োজাহাজের চলাচলের জন্য এ সংবাদ অপরিহার্য্য ; তাছাড়া, এ সংবাদের বিশেষ প্রয়োজন বন্দর কর্তৃপক্ষের, প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধবাহিনীর।

আজকাল টিরোস জাতীয় (Tiros) কৃত্রিম উপগ্রহ অনুক্ষণ আকাশ পরিক্রমা করছে এবং সঠিক ও নির্ভুলভাবে আকাশের অবস্থা প্রতিমুহূর্ত্তে জানিয়ে দিচ্ছে। 1960-এর ১লা এপ্রিল প্রথম টিরোস উপগ্রহটিকে আকাশে ওর কক্ষপথে দেওয়া হয়। তারপর থেকে আরও অনেকগুলি এজাতীয় 'আবহাওয়া উপগ্রহ (Weather satellite)' আকাশে রাখা হয়েছে। পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে কোথায় কি রকম নিম্নচাপ হচ্ছে, কত বেগে কোনদিকে সেই নিম্নচাপ-কেন্দ্র যাচ্ছে, তাপমাত্রা কত, এসব সংবাদ স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে উপগ্রহ সংগে সংগেই পৃথিবীতে পাঠাচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সারা পৃথিবী সে খবর জানতে পারছে এবং সতর্ক হ'তে পারছে। টিরোস শুধু

সংবাদই দেয় না, নবজাত সাইক্লোনের জন্মচিত্র পর্য্যন্ত বিশেষ ক্যামেরার সাহায্যে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এখানে টিরোস থেকে পাওয়া একটা ঘূর্ণবাতের ভ্রূণ-অবস্থার চিত্র দেওয়া হ'ল (চিত্র ৩৪)। উড়োজাহাজ, রাডার প্রভৃতি দিয়ে বড় জোর

চিত্র ৩৪। ঘূর্ণবাতের জন্ম (টিরোস থেকে পাওয়া)

100-200 বর্গ মাইল এলাকার অবস্থা জানা যেতে পারে, কিন্তু টিরোস প্রদক্ষিণ ক'রে যাবার সময় একবারেই অন্ততঃ পাঁচলক্ষ বর্গমাইল আকাশ ক্ষেত্রের ছবি পাঠাতে পারে এবং সেটা দশ মিনিটের মধ্যেই। একটা দৃষ্টান্ত দিই। দিনটা ছিল, ৫ই নভেম্বর, 1964। মাদ্রাজে মোটামুটি আবহাওয়া ভালই ছিল। কিন্তু টিরোস-৪ থেকে সংবাদ এল : '12° উঃ অক্ষাংশে এবং 81° পূঃ দ্রাঘিমাতে আন্দামানের পশ্চিমে নিম্নচাপ দেখা দিচ্ছে এবং সেটা উত্তরের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে।' হিসেব ক'রে আবহাওয়াবিদগণ মাদ্রাজ এবং সন্নিহিত অঞ্চলকে বিপদ-সঙ্কেত পাঠালেন। পরদিন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুরজীর মাদ্রাজের সৈকতে বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল, সেটা বাতিল করে দেওয়া হ'ল। পরদিন সন্ধ্যায় ঠিক হিসেব মতোই 24 ঘন্টায় প্রায় 300 শত মাইল অতিক্রম ক'রে এসে এক প্রবল ঝড় মাদ্রাজকে লণ্ড ভণ্ড ক'রে দিয়ে গেল। ঝড়ের বাতাসের বেগ ছিল ঘন্টায় 53 মাইল। প্রচুর ক্ষতি হ'ল, কিন্তু প্রয়োজনীয় সতর্কতার জন্যে সেটা অনেকটা সীমিত হ'ল আর কোন প্রাণহানি হ'ল না।

উপরের আবহাওয়ার, বিশেষ করে ঝড়ো-বাতাসের গতিবেগ এবং দিক, তাপমাত্রা প্রভৃতি জানার জন্যে ত্রিবান্দ্রামের কাছে চুম্বকীয় নিরক্ষরেখার উপরে তৈরী হয়েছে থুম্বা রকেট

ষ্টেশন। এখান থেকে রকেট-উৎক্ষেপণ করে 19 থেকে 125 মাইল উপরের বায়ুস্তরের নানা খবর সংগ্রহ করা হ'চ্ছে। সেটাও যথেষ্ট কাজে লাগছে।
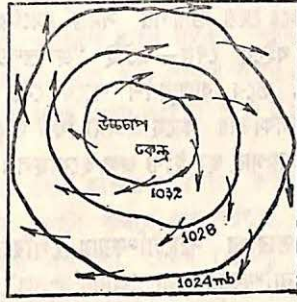
চিত্র ৩৫। প্রতীপ ঘূর্ণবাত (উত্তর গোলার্ধে)

কাছাকাছি দু'টি ঘূর্ণবাতের মাঝখানে অনেক সময় একটা উচ্চচাপ কেন্দ্রের উদ্ভব হয়। তখন সেই উচ্চচাপ কেন্দ্র থেকে বাতাস বাইরের দিকে চক্রাকারে বেরিয়ে আসতে থাকে থাকে, একে বলা হয় 'প্রতীপ ঘূর্ণবাত' (Anti-cyclones)। ঘূর্ণবাত এলে ব্যারোমিটারের পারা নেমে যায়, অর্থাৎ নিম্নচাপ দেখা দেয়, সেটা ঝড়-বাদলের আভাস নির্দেশ করে। আর প্রতীপ ঘূর্ণবাতে ব্যারোমিটারের পারা উপরে উঠে যায়, সেটা শুষ্ক ও ভাল আবহাওয়ার লক্ষণ। প্রতীপ ঘূর্ণবাতের গতি ঘূর্ণ-বাতের বিপরীত দিকে (চিত্র ৩৫)।

নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেও ঘূর্ণবাত হয়। সেখানে একটা গরম বাতাস যদি একটা ঠান্ডা বাতাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আসে তাহ'লে একে অপরকে নিয়ে ঘুরতে থাকে এবং ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রেও ঝড় হয় তবে নিরক্ষীয় অঞ্চলের সাইক্লোনের মত তীব্র নয়: মৃদুগতি এবং বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম।

অল্প পরিসরের ঘূর্ণবাতকে বলে ঘূর্ণি বা টর্ণেডো (Tornado) এদের কেন্দ্রের ব্যাস 1000/2000 ফিটের বেশী নয়। সেখানে চাপ অত্যন্ত কম। কেন্দ্রের চারদিকে বাতাস পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঘুরতে ঘুরতে উপরে ওঠে। আর সম্পূর্ণ ঘূর্ণিটা দুর্দম বেগে একদিকে ছুটতে থাকে। আয়তনে ছোট বটে, কিন্তু তীব্রতা খুব বেশী। পথে যা কিছু পড়ে সব ধ্বংস ক'রে চলে যায়। 20/30 মাইল পর্য্যন্ত ঘূর্ণি সাধারণতঃ চলে। ছোট ছোট বাড়ীর ভিতসুদ্ধ, বড় বড় গাছ শিকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে ঘূর্ণি চলে যায়। বেশ বড় বড় গাড়ী, বাড়ীর ছাত এসব উড়িয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দেয়, মানুষ জীবজন্তুর ত' কথাই নেই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই ঘূর্ণির সংখ্যা বেশী। একবার ডাকোটাতে গ্রেট নর্দান রেলের একটা ট্রেনকে লাইন থেকে তুলে অন্যত্র বসিয়ে রেখে গিয়েছিল এক প্রচন্ড ঘূর্ণি। প্রবল ঘূর্ণির কেন্দ্রে যদি কোন বাড়ী এসে যায়, তবে সেখানে বাইরের চাপ হঠাৎ খুবই কমে যায় আর বাড়ীর ভেতরের চাপ থাকে খুব বেশী, সুতরাং ভেতরের চাপের জন্য বাড়ীটা বিস্ফোরণ-সহ ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

ঘূর্ণির মাঝখানের ছোট কেন্দ্র থেকে বাতাস উপরে উঠে ছড়িয়ে যায়। কাজেই একটা ঘূর্ণায়মান বাতাসের ফানেল তৈরী হয়। সমুদ্রের ওপর দিয়ে যখন ঘূর্ণি চলে, কখনও এই ফানেল দিয়ে ঘূর্ণি সমুদ্র থেকে জল শুষে উপরে তুলে নিয়ে শীতল মেঘের রাজ্যের সঙ্গে যোগ করে দেয়, তারপর সমস্ত মেঘের বিপুল জলরাশি ফানেল দিয়ে নেমে এসে প্লাবন বইয়ে দেয়—এটাই "জলস্তম্ভ"। তেমনই ঘূর্ণি যদি মরুভূমির উপর দিয়ে যায়, তবে বালুরাশি শুষে নেয় ; বালুস্তম্ভের সৃষ্টি হয়। শোনা যায়. 1856 সালে কলকাতার কাছে 1500 ফিট উঁচু এক জলস্তম্ভ থেকে জলের ধারায় প্রায় আধ বর্গমাইল জায়গায় ছয় ইঞ্চি জল হয়েছিল।

আয়নোস্ফিয়ার

ট্রোপোস্ফিয়ার আর তারপর স্ট্রাটোস্ফিয়ার পেরিয়ে আরও উপরে উঠলে যে বায়ুস্তর তার নাম "আয়নোস্ফিয়ার" বা 'আয়ন-মণ্ডল'। এখানকার বাতাস অত্যন্ত হালকা, ঘনত্ব খুবই কম, অণুগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ব্যবধান অনেকটা। কিন্তু এই স্তরটির বিস্তৃতি যথেষ্ট। 70/80 কিলোমিটার উচ্চতা থেকে শুরু ক'রে প্রায় 800 কিলোমিটার পর্যন্ত। বিস্তার যথেষ্ট হ'লেও আয়নোস্ফিয়ারে বাতাসের মোট ভরের মাত্র 1/200 অংশ রয়েছে।

আয়নোস্ফিয়ারের বাতাস খুবই তনুকৃত বটে, কিন্তু সেই বাতাস খুব তড়িৎবাহী। একথা এখন সকলেরই জানা, পদার্থ মাত্রেই অণু পরমাণুর সমষ্টি। পরমাণুগুলো সাধারণ অবস্থায় তড়িৎ-নিরপেক্ষ তাদের কোন নীট তড়িৎ-আধান নেই. যদিও পরমাণু গঠিত হয়েছে কতগুলো ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক বিদ্যুৎবাহী কণা দিয়ে; সঙ্গে অবশ্য তড়িৎ-মাত্রাহীন নিউট্রনও রয়েছে। বিদ্যুৎ-বাহী কণাগুলো হচ্ছে ইলেকট্রন আর প্রোটন। পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটন সংখ্যা সমান থাকে বলে পরমাণুর কোন বিদ্যুৎমাত্রা থাকে না। কিন্তু পরমাণু যদি কোন শক্তিশালী বিকিরণের, যেমন রঞ্জনরশ্মি বা অতি-বেগুনী রশ্মির, সংস্পর্শে আসে তবে পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রনের বিচ্যুতি ঘটে। ফলে, পরমাণু ভেঙে গিয়ে ঋণাত্মক ইলেকট্রন এবং ধনাত্মক বস্তুকণার উদ্ভব হয়। এরকম তড়িতাবিষ্ট কণাকে বলে "আয়ন"। কিন্তু পুনরুক্তি দোষ হ'ল, কারণ এসব কথা প্রকারান্তরে আগেই বলা হয়েছে।

এবার আয়নোস্ফিয়ারের কথায় ফিরে যাই। আলোকরশ্মি এবং তাপরশ্মির সঙ্গে সূর্য্য থেকে আরও অনেক অদৃশ্য রশ্মি উৎসারিত হ'য়ে পৃথিবীতে নিরন্তর আসছে। এদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব ছোট, অতি-বেগুনী রশ্মিও রঞ্জন-রশ্মি জাতীয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত ছোট হবে তরঙ্গের শক্তি হয় তত বেশী। অর্থাৎ সূর্য্য-রশ্মিতে প্রচুর অদৃশ্য খুব শক্তিশালী তরঙ্গও রয়েছে। এই বিকিরণ যখন বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে এসে পৌঁছয় তখন গ্যাসের পরমাণু প্রথমতঃ এই শক্তিশালী তরঙ্গগুলিকে সোজাসুজি শুষে নেয়। এর ফলে যে শুধু প্রচুর তাপ জমে এবং উপরের স্তরের উষ্ণতা বেড়ে যায় তাই নয়, পরমাণুগুলো আয়নিতও হ'য়ে যায়। অজস্র ইলেকট্রন আর ধনাত্মক বস্তুকণার সৃষ্টি হয়। প্রচুর আয়ন থাকায় এই বাতাস বিদ্যুৎ-পরিবাহী হয় এবং এই জন্যেই এই স্তরের নাম দেয়া হয়েছে "আয়নোস্ফিয়ার"।

মনে হ'তে পারে ক্রমাগত সৌর কিরণ শোষণের ফলে ইলেকট্রন ও আয়নের পরিমাণ নিরন্তর বেড়েই যাবে। কিন্তু আবার বিপরীত বিক্রিয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। কণাগুলো সবসময়েই ছুটোছুটি করছে আর পরস্পরের ভিতর সংঘর্ষ হচ্ছে। আয়নিত কণাগুলো এবং ইলেকট্রনগুলোও এভাবে ধাক্কা দিচ্ছে এবং ধাক্কা খাচ্ছে। একটি ইলেকট্রন যদি কোন ধনাত্মক কণার সঙ্গে ধাক্কা খায় তাহ'লে দু'য়ে মিলে আবার তড়িৎ-নিরপেক্ষ অণু বা পরমাণুতে পরিণত হ'য়ে যাবে। আবার কখনও তড়িৎ-নিরপেক্ষ কণার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ইলেকট্রনটি তার সঙ্গে সংহত হ'য়ে একটা ঋণাত্মক কণা তৈরী করবে। এটা আবার একটা ধনাত্মক কণার সংঘর্ষে এলে উভয়েই তড়িৎ-নিরপেক্ষ কণায় পরিণত হ'তে পারে।

দেখা যাচ্ছে, উচ্চ বায়ুস্তরে সৌর রশ্মির শক্তিশালী তরঙ্গগুলি মুক্ত ইলেকট্রন এবং আয়ন তৈরী করছে। আর একটা কথাও বলা দরকার, সূর্য্যদেহ থেকে সৌর রশ্মির সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ হালকা বস্তুকণা, যেমন প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন ইত্যাদিও বিপুলবেগে উৎসারিত হ'য়ে আসে। এরাও উচ্চস্তরের বায়ুর আয়নীকরণে যথেষ্ট অংশ নেয়। এই আয়নীকরণে সুদূর নক্ষত্রমণ্ডলী থেকে আসা মহাজাগতিক রশ্মিও সামান্য কিছু অংশ নেয়। অপর দিকে, আয়নগুলোর এবং বস্তুকণাগুলোর সংঘর্ষে এবং পুনর্মিলনে আয়ন ও ইলেকট্রন লোপ পাচ্ছে। এই দুই বিপরীত বিক্রিয়ার মধ্যে একটা ভারসাম্য রয়েছে, তাই যে কোন একটা স্তরে আয়নের ও ইলেকট্রনের গড় পরিমাণ মোটামুটি নির্দিষ্ট দেখা যায়। বলা বাহুল্য, বায়ুর ঘনত্ব বেশী হলে সংঘর্ষে আয়নের লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এই কারণেই আয়নোস্ফিয়ারের ভিতরে যত উপরের দিকে যাওয়া যাবে আয়নের প্রাচুর্য্য তত বেশী। আয়নোস্ফিয়ারের নীচের অংশে আয়নের পরিমাণ কম।

সূর্য্য থেকে উৎসারিত হ্রস্ব-তরঙ্গগুলির আয়নোস্ফিয়ারে শোষণ না হ'লে সেগুলো ভূতলে এসে উপস্থিত হ'ত আর তা হ'লে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হ'ত। আয়নোস্ফিয়ার সেই ধ্বংস থেকে আমাদের রক্ষা করছে। এছাড়াও আয়নোস্ফিয়ার অঞ্চলের আরও গুরুত্ব রয়েছে। বেতার তরঙ্গকে আয়নোস্ফিয়ার প্রতিফলিত ক'রে দেয়, যেমন আলোর তরঙ্গ প্রতিফলিত হ'য়ে আসে আয়না থেকে। এই প্রতিফলনের জন্যেই আমরা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বেতার সংবাদ পাঠাতে পারছি।

এর একটু পূর্ব্বকথা আছে। এ শতাব্দীর প্রথম বছরেই মারকনি পরীক্ষা ক'রে দেখালেন যে, ইউরোপ থেকে পাঠান বেতার-তরঙ্গকে আমেরিকাতে অনায়াসেই ধরা যেতে পারে। বড় বড় পাহাড় পর্ব্বত বাধাবন্ধ অতিক্রম ক'রে এ তরঙ্গ কি ক'রে পৌঁছুতে পারে ? আলোর তরঙ্গ আর বেতার-তরঙ্গ দুই-ই বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, উভয়েই সরল রেখায় চলে, উভয়েরই গতিবেগ এক সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। কিন্তু আলোর তরঙ্গ ত' এ সব বাধা পেরিয়ে গিয়ে দূরান্তরে পৌঁছয় না। প্যারিসের আলোক-রশ্মি কেন তা হ'লে নিউ-ইয়র্কে যাবে না। তার পরের বছরেই (1902), ইংল্যাণ্ডের হেভিসাইড এবং আমেরিকার কেনেলি এর একটা ব্যাখ্যা দিলেন। ল্যাবরেটরীতে দেখা গেছে ইলেকট্রন বা তড়িৎ-কণার সংস্পর্শে বেতার-তরঙ্গের গতিপথ বেঁকে যায়, এমন কি বিপরীত দিকেও ফিরে যেতে পারে। কেনেলি ও হেভিসাইড প্রস্তাব করলেন, বায়ুমণ্ডলের

খুব উচ্চস্তরে যেখানে বাতাস খুব হালকা, সেখানে নিশ্চয়ই বিদ্যুৎবাহী স্তর রয়েছে যেখানে গিয়ে বেতার-তরঙ্গ ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে অর্থাৎ প্রতিফলিত হচ্ছে। যদিও তখনও কোন সাক্ষাৎ-প্রমাণ মেলেনি, তবু বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছিলেন, অনেক উঁচুতে বিদ্যুৎ-পূর্ণ বায়ুস্তর রয়েছে। এই স্তরের নাম দেওয়া হ'ল, "হেভিসাইড-কেনেলী স্তর"। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে বেতার-তরঙ্গ মাপজোকের যন্ত্র-সরঞ্জামের অনেক উন্নতি হ'ল, তার সাহায্য নিয়ে 1944 সালে অ্যাপেলটন এবং বার্নেট এই বিদ্যুৎবাহী বায়ুস্তরের শুধু অস্তিত্ব নয়, তার উচ্চতা পর্যন্ত স্থির করে দিলেন, বেতার-তরঙ্গকে খাড়া উপরের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল, সেই তরঙ্গ প্রতিফলিত হ'য়ে সেখানেই ফিরে এসে গ্রাহক যন্ত্রে ধরা পড়ল। তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং তার গতিবেগও জানা আছে, সুতরাং ফিরে আসতে যে সময়টা লাগল সেটা মেপে আয়নোস্ফিয়ারের উচ্চতা জানতে পারা গেল। কিন্তু একটা নতুন সমস্যা দেখা দিল। দীর্ঘ বেতার-তরঙ্গ পাঠালে যে উচ্চতা থেকে ফিরে আসে, হ্রস্ব তরঙ্গ কিন্তু তার চেয়ে আরও বেশী উঁচুতে গিয়ে তারপর প্রতিফলিত হয়। এ থেকে বোঝা গেল বিদ্যুৎবাহী বিভিন্ন স্তর রয়েছে। আর ভিন্ন ভিন্ন স্তর বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গকে প্রতিফলিত ক'রে মাটিতে ফিরিয়ে দেয়। এই দূরবর্তী স্তরটির তখন নাম হয়েছিল "অ্যাপেলটন স্তর"।

তারপর গত তিন দশকে আয়নোস্ফিয়ার সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। এখন আমরা জানি আয়নোস্ফিয়ারে রয়েছে চারটি স্তর, বিভিন্ন
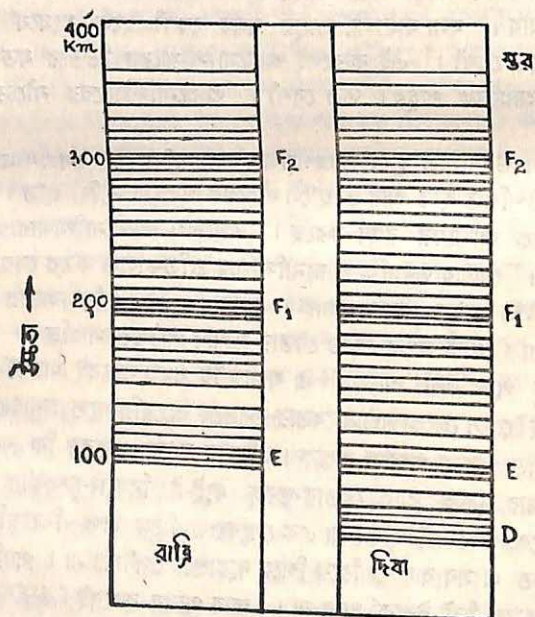
চিত্র ৩৬। আয়নোস্ফিয়ারের বিভিন্ন স্তর

উচ্চতায়। বিভিন্ন স্তরের মোট তড়িৎ-আধানের পরিমাণ অর্থাৎ বিদ্যুৎকণার

প্রাচুর্য্য বিভিন্ন। সবচেয়ে নীচু স্তরকে বলা হয় D-স্তর এবং তারপর পর পর
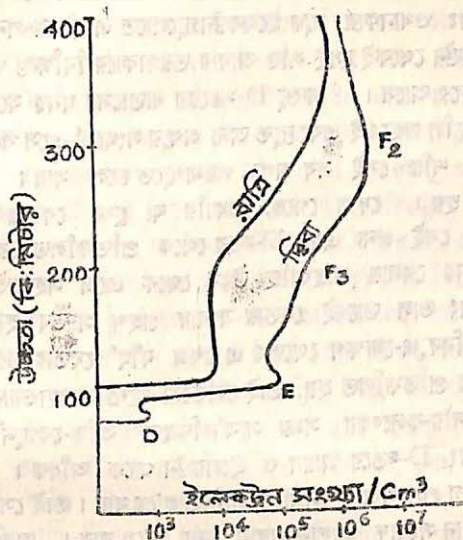
চিত্র ৩৭। আয়নোস্ফিয়ারের বিভিন্ন স্তরে আয়নের পরিমাণ

রয়েছে E, F_1 এবং F_2 স্তর (চিত্র ৩৬)। বিভিন্ন স্তরের প্রতি ঘন সেণ্টিমিটারে কি পরিমাণ আয়ন থাকে তার একটা ধারণা হ'বে চিত্র ৩৭ থেকে।

D-স্তরটি রয়েছে ভূপৃষ্ঠ থেকে 70/80 কিলোমিটার উচ্চতায়। বিভিন্ন আয়নিত স্তরের মধ্যে এই স্তরের ইলেকট্রন-সংখ্যা কম। কোন স্তরের আয়নীভবন নির্ভর করে (১) কি রকম প্রখর সৌরকিরণ সেখানে পেঁছয় অর্থাৎ তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, (২) কতটা বায়ুর ভেতর দিয়ে কতটা সৌর-সুবিন্দু কোণে (solar zenith angle) এসে কিরণ সেই বায়ুস্তরে পেঁাছবে, আর (৩) সেখানকার বাতাসের অণু ও পরমাণুগুলো সেই অদৃশ্য রশ্মি শোষণ করতে পারবে কিনা। আগেই বলা হয়েছে কেবল মাত্র অদৃশ্য অতি-বেগুনী এবং রঞ্জনরশ্মি জাতীয় তরঙ্গগুলোই আয়ন-ক্রিয়া ঘটায়। এই সব রশ্মির মধ্যে যাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বেশী সেগুলো উচ্চতর স্তরেই শুষে যায়। আরও খুব ছোট তরঙ্গ, যাদের দৈর্ঘ্য 10 A°-এর কাছাকাছি সেগুলো অনেকটা প্রবেশ ক'রে এসে আয়নিত D-স্তর সৃষ্টি করে ($1A° = 10^{-8}$ সেন্টি.)। কিন্তু এদের পরিমাণ বেশী নয় বলে স্তরটি তত বেশী আয়নিত হ'তে পারে না। D- স্তরে আয়ন সৃষ্টির আরও একটা সম্ভাবনা আছে। সূর্যদেহের হাইড্রোজেন থেকে 1216 A° দৈর্ঘ্যের এক তরঙ্গস্রোত বিচ্ছুরিত হ'য়ে আসে; একে বলে "লাইমেন তরঙ্গ" (Lyman lines)। উপরের স্তরের অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদির এই তরঙ্গ শোষণের ক্ষমতা নেই। এই তরঙ্গ যখন আরও নীচে আসে তখন বাতাসে যে সামান্য নাইট্রিক অক্সাইড আছে তার অণুগুলো এই তরঙ্গ টেনে নিয়ে আয়নিত হয় এবং এ ভাবেও D-স্তর খানিকটা তৈরী হয়।

বেতার-তরঙ্গগুলি উৎস থেকে যখন উপরে উঠে আয়নোস্ফিয়ারে উপস্থিত হয় তখন তরঙ্গাঘাতে প্রথমতঃ ওখানকার মুক্ত ইলেকট্রনগুলোতে একটা কম্পন বা দোলা লাগে। এই কম্পমান ইলেকট্রন থেকেই সেই শক্তি আবার তরঙ্গাকারে বিক্ষিপ্ত ও প্রতিফলিত হ'য়ে পৃথিবীর দিকে ফিরে আসে। কিন্তু D-স্তরের বাতাসের ঘনত্ব যথেষ্ট, সুতরাং এই কম্পমান ইলেকট্রনগুলি সহজেই এবং দ্রুত অন্য অণুর সংঘর্ষে এসে পড়ে। ফলে বেতার-তরঙ্গের খানিকটা শক্তি সেই সব অণু পরমাণুতে চলে যায়। মোটকথা, বেতার-তরঙ্গের শোষণ হয়। দেখা গেছে, মাঝারি বা হ্রস্ব বেতার-তরঙ্গকে D-স্তর শোষণ করে এবং সেই জন্য এরা D-স্তর থেকে প্রতিফলিত হয় না। খুব দীর্ঘ বেতার-তরঙ্গ দিনের বেলায় কাছকাছি উৎস থেকে এলে সহজেই D-স্তর থেকে প্রতিফলিত হয় এবং ভাল ভাবেই বেতার-সংবাদ গ্রহণ সম্ভব হয়। এখানে বলা প্রয়োজন, মেঘের বিদ্যুৎ-মোক্ষণ থেকেও এ রকম দীর্ঘ বেতার-তরঙ্গ আসে। আর সেগুলোও D-স্তরে প্রতিফলিত হয়, তাই রেডিয়ো যন্ত্রে আবহাওয়ার উৎপাত আমরা শুনতে পাই। সৌর-কলঙ্কের সময় সূর্যরশ্মিতে অতি-বেগুনী ছোট তরঙ্গের প্রচুর্য্য ঘটে, সুতরাং D-স্তরে আয়ন ও ইলেকট্রন থাকে অধিক। সুতরাং হ্রস্ব ও মাঝারি বেতার-তরঙ্গ প্রায় সবটাই সেখানে শোষিত হ'য়ে যায়। তাই সেই সময়ে রেডিয়োর তরঙ্গ সাহায্যে কোন সংবাদ আদান-প্রদান বন্ধ হ'য়ে যায়। অন্যদিকে রাত্রিবেলায় সৌরকিরণ না থাকার জন্যে D-স্তরের অনেকটাই লোপ পেয়ে যায়।

D-স্তরের পর 100 কিলোমিটারের একটু বেশী উচ্চতায় হ'ল E-স্তর। এবং আরও
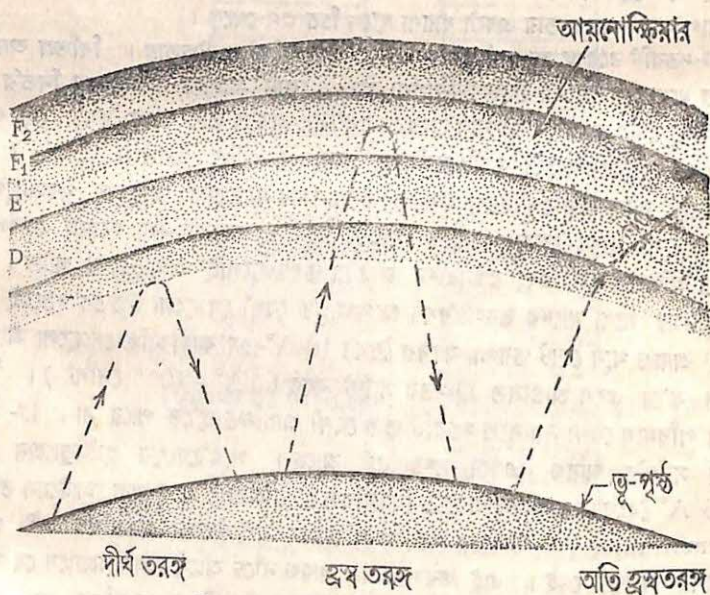
চিত্র ৩৮। বিভিন্ন বেতার-তরঙ্গের গতিপথ

উঁচুতে 200 কিলোমিটারের কাছে রয়েছে F_1-স্তর। এদের মুক্ত ইলেকট্রন সংখ্যা প্রচুর।

গ্যাস এখানে বিরল, ধাক্কাধাক্কির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। এই দুইটি বিদ্যুৎবাহী বায়ুস্তর অনেকটা সুস্থির, যদিও রাত্রিকালে এদের ভিতরের আয়নক্রিয়া খানিকটা কম থাকে। পরীক্ষা থেকে জানা গেছে, এই সব স্তরে এবং উচ্চতর F_2-স্তরেও, সৌর-কিরণের 100A° দৈর্ঘ্যের রশ্মিগুলির দ্বারা এখানকার বাতাসের অণু-পরমাণুগুলো আয়নিত হ'য়ে থাকে। F_2-স্তর যথেষ্ট আয়নিত ও বিদ্যুৎবাহী, কিন্তু তার আচরণ এক এক সময় এক এক রকম, সেটা যেন একটু অস্থির প্রকৃতির।

হ্রস্ব বেতার-তরঙ্গ উপরের দিকে গিয়ে যখন আয়নোস্ফিয়ারে ঢোকে তখন D-স্তরে খানিকটা শোষিত হ'য়ে যায়। কিন্তু অধিকাংশ D-স্তর পেরিয়ে আরও উপরের E এবং F_1-স্তরে গিয়ে প্রতিফলিত হ'য়ে যায় আর পৃথিবীর দিকেই ফিরে আসে। বেতার-বার্তা পাঠানোর কাজে হ্রস্ব-তরঙ্গের কার্যকারিতা এই স্তরের জন্যই সম্ভব হয়েছে। বেতার-তরঙ্গগুলো যখন উপরের দিকে যায় তখন ক্রমশঃই কম আয়নিত স্তর থেকে বেশী আয়নিত স্তরে যায়। তাই স্বাভাবিক নিয়মে তরঙ্গ বেঁকে যায় অর্থাৎ প্রতিসরিতও হয়। বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যত কম হবে ততই সেটা উঁচুতে উঠতে পারবে। F_1-F_2 স্তরগুলো থেকে প্রতিফলিত হ'য়ে এই তরঙ্গ বহু দূরদূরান্তরে পৌঁছুতে পারে। অতি হ্রস্ব বেতার-তরঙ্গ, যার দৈর্ঘ্য দশ মিটারেরও কম, অনেক সময় মোটেই প্রতিফলিত না হ'য়ে, আয়নোস্ফিয়ার পেরিয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে (চিত্র ৩৮)। সেই কারণে এদের রাডার এবং টেলিভিসনে ব্যবহার করা সম্ভব।

জোরালো হ্রস্ব-তরঙ্গ আয়নোস্ফিয়ারে প্রতিফলিত হ'য়ে যখন পৃথিবীর গায়ে এসে
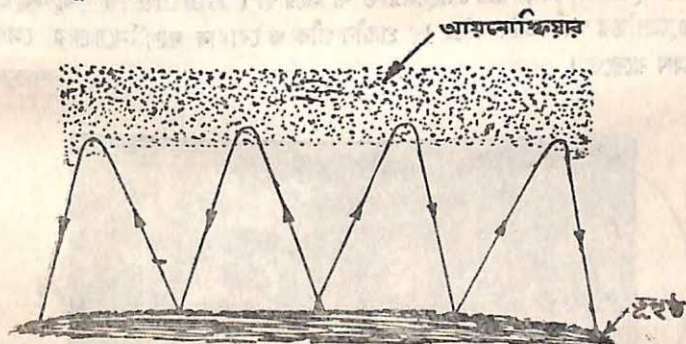
চিত্র ৩৯। ভূতল আর আয়নোস্ফিয়ারের মধ্যে হ্রস্ব তরঙ্গের বার বার প্রতিফলন

পড়ে, তখন সেখান থেকেও আবার প্রতিফলিত হ'য়ে উপরে উঠে যেতে পারে। এই রকম বারবার প্রতিফলিত হ'য়ে তরঙ্গ বহু বহু দূরে গিয়ে উপস্থিত হয়। এই ভাবেই দূরদূরান্তরের সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে (চিত্র ৩৯)।

1930-এর 12ই জানুয়ারী ক্রেনকেল উত্তর-মেরু সাগরের একটা ছোট্ট দ্বীপ থেকে একটা বেতার বার্তা পাঠান এবং সবাইকে তার উত্তর দিতে বলেন। অল্পক্ষণেই তিনি একটা জবাব পেলেন, দেখা গেল সেটা আসছে দক্ষিণ-মেরুর সন্নিকটে বার্ডের (Byrd)

অভিযাত্রী দলের শিবির থেকে। বার্ড তখন ছিলেন দক্ষিণ-মেরু অভিযানে ক্রেনকেলের দ্বীপ থেকে পৃথিবীর বিপরীত প্রান্তে। অর্থাৎ বেতার-বার্তাটি পৃথিবীর সম্ভাব্য বৃহত্তম দূরত্ব অতিক্রম করেছে—12500 মাইল। আয়নোস্ফিয়ার আর ভূপৃষ্ঠ থেকে হ্রস্ব তরঙ্গের পুনঃ পুনঃ প্রতিফলনের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল।

মেরুজ্যোতি

আয়নোস্ফিয়ারের আর একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা হচ্ছে মেরুজ্যোতি। মেরুবৃত্তের মধ্যে আর তার কাছাকাছি দেশগুলোতে রাত্রির আকাশে তাকালে অনেক উঁচুতে প্রায়ই এক অভিনব সুন্দর আলোর জ্যোতি দেখা যায়। উজ্জ্বল অপরূপ নানা রঙের সব আলোর ঝরণা অনেক উঁচু থেকে যেন পৃথিবীর দিকে নেমে আসছে। একই সময়ে আকাশের বুকে বিভিন্ন জায়গায় নানা রংয়ের আর নানা আকারের সব আলোর জ্যোতি ফুটে উঠছে। আবার ক্ষণে ক্ষণেই এদের আকার বদলে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে তাদের বর্ণ আর ঔজ্জ্বল্য। এক একটি আলোর রঙ একে একে আসে, মিলিয়ে যায়, আবার আসে, চলে আলোর ঝিলিমিলি। কখনও এরা লাল সবুজ হলদে সব তীক্ষ্ন বর্শার মতো, আবার পরক্ষণেই সেগুলো ফুলে গিয়ে পরিণত হ'চ্ছে বিচিত্র রংয়ের বড় বড় চওড়া পটিতে। কখনও ভাঁজে ভাঁজে ঝালরের মতো স্থির হ'য়ে রয়েছে, আবার ক্ষণপরেই প্রসারিত হ'য়ে মিলিয়ে যাচ্ছে বা ঢেউয়ের মত সরে সরে যাচ্ছে। মেরু অঞ্চলের আকাশে অনেক সময় সারারাত ধ'রে চলে এমনি বিচিত্র আলোর খেলা। অলৌকিক এর দীপ্তি, অবর্ণনীয় এর ছটা—এ এক অপূর্ব বিস্ময়কর দৃশ্য। এরই নাম মেরুজ্যোতি বা অরোরা (Aurora)। যুগযুগ ধ'রে এই মেরুজ্যোতির আবির্ভাব ঘটছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান দার্শনিকেদের লেখাতেও এর উল্লেখ রয়েছে।
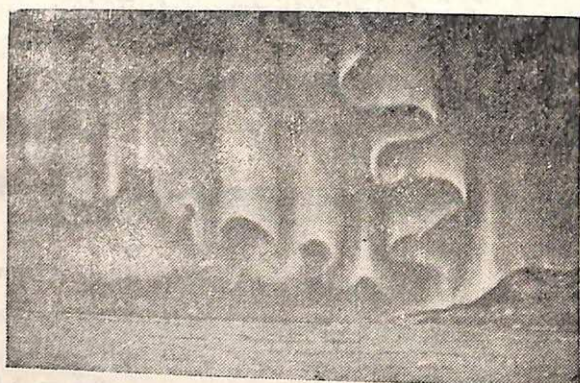
চিত্র ৪০। মেরুজ্যোতি

মেরু অঞ্চলের বাইরে এ রকম জ্যোতি কদাচিৎ দেখা যায়। খুব জোরালো মেরু-জ্যোতির আবির্ভাব ঘটলে কখনও কখনও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেও, এমনকি মস্কো বা

স্কটল্যাণ্ডে থেকেও দেখা যায়, যেমন দেখা গিয়েছেল 1938 ও 1956 সালে। সাধারণতঃ উত্তর কানাডা, সাইবেরিয়া, আইসল্যাণ্ড, নভো-জেমলা, উত্তর নরওয়ে এসব জায়গা থেকে খুব সুন্দর মেরুজ্যোতি দেখা সম্ভব। দক্ষিণ মেরুবৃত্তের কাছে গেলেও মেরুজ্যোতি দেখা যায়। মেরু-অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন কুক এর নাম দিয়েছেন "অরোরা অস্ট্রালিস" কারণ উত্তর মেরুর মেরুজ্যোতির নাম "অরোরা বোরিয়ালিস্"।

মেরুজ্যোতির নীচের দিকের সীমানা মোটামুটি ভূতল থেকে 100 কিলোমিটার উঁচুতে আর উপরের দিকে সেটা বিস্তৃত হয়ে যায় প্রায় 500 কিলোমিটার পর্যন্ত। এসব মাপজোক বিজ্ঞানীরা এই কিছুদিন আগে সঠিকভাবে করতে পেরেছেন। দেখা যাচ্ছে, মেরুজ্যোতির আবির্ভাব ঘটে আয়নোস্ফিয়ারের রাজ্যে। কিভাবে মেরুজ্যোতির সৃষ্টি হয় এই প্রশ্নটিই প্রথমে মনে আসে। এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে পরমাণুর সম্বন্ধে একটু জানা দরকার।

প্রত্যেক পরমাণুই কতকগুলি নিউট্রন, প্রোটন আর ইলেকট্রন দিয়ে গঠিত। তড়িৎ-নিরপেক্ষ নিউট্রন এবং পরাবিদ্যুৎযুক্ত প্রোটনগুলি একত্র পুঞ্জীভূত হ'য়ে কেন্দ্রে থাকে, আর এই কেন্দ্রের চারিদিকে ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন কক্ষপথে নিরন্তর ঘুরছে। কিন্তু এই ইলেকট্রনসমূহ যে কোন কক্ষপথে ঘুরতে পারে না, এরা শুধু কতকগুলি নির্দিষ্ট কক্ষপথে থেকেই কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে। কক্ষপথগুলিকে "কোয়াণ্টাম স্তর" বলা হয়। বিভিন্ন কোয়াণ্টাম স্তরে বা কক্ষপথে থাকার জন্য ইলেকট্রনের শক্তির পরিমাণও বিভিন্ন হয়। কেন্দ্র থেকে ইলেকট্রনের কক্ষপথ যত দূরে হবে, ইলেকট্রনের শক্তির পরিমাণও তত বেশী হবে। যেমন, অক্সিজেন পরমাণুর কেন্দ্রে আটটি প্রোটন ও আটটি নিউট্রন একত্র পুঞ্জীভূত আছে, আর বাইরে রয়েছে দুইটি কক্ষপথে যথাক্রমে দুইটি এবং ছয়টি ইলেকট্রন। দ্বিতীয় কক্ষবৃত্তের ইলেকট্রনের শক্তির পরিমাণ প্রথম কক্ষবৃত্তের ইলেকট্রনের চেয়ে বেশী (চিত্র ৪১)। অন্যান্য মৌলের পরমাণুতেও
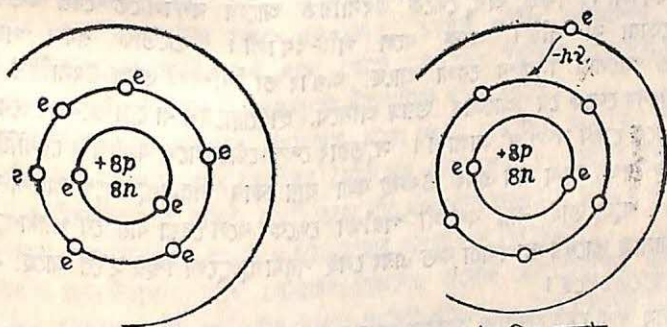
চিত্র ৪১। অক্সিজেন পরমাণুর ইলেকট্রন-বিন্যাস

এইরূপ কেন্দ্র রয়েছে এবং তার বাইরে বিভিন্ন নির্দিষ্ট কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলো ঘুরছে। যদি কোন সময় বাইরের শক্তি পেয়ে একটি ইলেকট্রন নিজের কক্ষপথ ছেড়ে

দূরের কক্ষপথে চলে যায়, তবে শক্তিমাত্রা বৃদ্ধির জন্য পরমাণুটি উত্তেজিত অবস্থায় থাকে।

আমরা অনেক সময়েই দেখি গ্যাস থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যেমন, মারকারি ল্যাম্পে, নিয়ন লাইটে। গ্যাসও ত অণু-পরমাণুর সমষ্টি। সুতরাং গ্যাসের পরমাণু থেকেই আলো বেরিয়ে আসে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় কোন আলোকরশ্মি পরমাণু থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। যদি কোন শক্তিশালী বস্তুকণা যেমন, ইলেকট্রন বা আয়ন বা কোন হ্রস্ব দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ এসে পরমাণুকে আঘাত করে, তখন সেই শক্তি পেয়ে পরমাণুর ইলেকট্রন নিজের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পরমাণুর মধ্যেই অপর একটা দূরবর্তী কক্ষপথে চলে যায়। তখন পরমাণুটি উত্তেজিত অবস্থায় (excited) থাকে। একটু পরেই আবার কক্ষচ্যুত ইলেকট্রনটি নিজের কক্ষে ফিরে আসে। ফিরে আসার সময় যে শক্তিটা সে পেয়েছিল, সেটা আলো হ'য়ে পরমাণু থেকে বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে। তাই দেখি, গ্যাস থেকে আলোর বিকিরণ হচ্ছে।

যদি অপর কণার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ইলেকট্রনটি পরমাণু থেকে একেবারে বিচ্যুত হ'য়ে যায়, তাহ'লে পরমাণুটি আয়নিত হয়। তখন কিন্তু আলো-বিকিরণ হয় না। আরও একটা কথা, গ্যাস যদি খুব কম চাপে থাকে তবেই উত্তেজিত পরমাণু থেকে আলো-রশ্মি বেরোয়। সাধারণ চাপে থাকলে, সেখানে থাকে অসংখ্য অণু-পরমাণু। উত্তেজিত পরমাণু তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে আসে এবং ওর শক্তিটা তাতেই ব্যয় হ'য়ে যায়। সুতরাং সাধারণ চাপে থাকলে গ্যাস থেকে আলোর বিচ্ছুরণ হয় না। এই কারণেই নিয়ন ল্যাম্পের নলের ভিতর চাপ খুব কমিয়ে দিতে হয়।

কি ধরণের আলো, কত তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, এ সব পদার্থবিদরা স্থির করেন বর্ণালী-বিশ্লেষণ যন্ত্র বা স্পেকট্রোস্কোপ দিয়ে। পরমাণু থেকে বিচ্ছুরিত আলোর তরঙ্গ বর্ণালীতে এসে কতকগুলি সরু সরু রেখা সৃষ্টি করে, একে বলে পরমাণু-বর্ণালী বা রেখ-বর্ণালী। কিন্তু অণু থেকে উৎসারিত আলো বর্ণালীতে দেয় কতকগুলো প্রশান্ত ডোরা বা পটি। একে বলে পটি-বর্ণালী। প্রত্যেক রকম পরমাণুর উৎসারিত আলোর নিজস্ব রেখা আছে, অর্থাৎ তা নির্দিষ্ট তরঙ্গ উৎসারিত করে। নাইট্রোজেনের থেকে যে আলোর তরঙ্গ আসবে, হাইড্রোজেন বা ক্লোরিনের থেকে আসা আলো থেকে সেটা সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং স্পেকট্রোস্কোপে বর্ণালীর রেখাটি পেলে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য জানা যায় এবং তখনই বলা যায় কোন পরমাণু থেকে আলো-রশ্মিটি আসছে। শুধু তাই নয়, বর্ণালী পরীক্ষা থেকে বলে দেয়া যায়, যে পরমাণু থেকে আলো আসছে তাদের তাপমাত্রা কত এবং সেই পরমাণুগুলো স্থির হ'য়ে আছে, না দ্রুত গতিতে ছুটে চলছে।

এ সব তথ্য মেরুজ্যোতি বুঝতে খুব সাহায্য করেছে। সূর্য্যদেহ থেকে তাপ এবং আলোকের অজস্র তরঙ্গের সঙ্গে প্রচুর সূক্ষ্ম বস্তুকণাও বিচ্ছুরিত হ'য়ে আসে, এই কণাগুলোর প্রধান হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন (বা প্রোটন) এবং ইলেকট্রন। এরা তড়িৎবাহী আয়ন, সে জন্য ত' এমনিই বেশ শক্তিশালী, তাছাড়া এগুলো ছুটে আসে যথেষ্ট গতিবেগে, তাতেও ওদের শক্তি যথেষ্ট বেড়ে যায়। বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বসীমায়, যেখানে বায়ু খুবই বিরল এবং চাপ খুব কম, সেখানে এসে এরা গ্যাসের অণু ও পরমাণুর

সঙ্গে ধাক্কা খায়। এখানে অতি-বেগ‍ুনী রশ্মিও আসে, এই রশ্মির সংস্পর্শে অক্সিজেন প্রায় সবটাই এবং নাইট্রোজেনের অণ‍ুরও অধিকাংশই ভেঙে পরমাণ‍ুতে পরিণত হ'য়ে থাকে। এই পরমাণ‍ুগ‍ুলি শক্তিশালী প্রোটন আর ইলেকট্রনের সংঘাতে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। উত্তেজিত পরমাণ‍ু থেকে তারপর আলো বিচ্ছ‍ুরিত হয় স্বাভাবিক নিয়মেই, যেমন ক'রে নিয়ন-ল্যাম্পের আলো-বিকিরণ ঘটে। উপরের বায়‍ু তন‍ুকৃত থাকাতেই এবং ইলেকট্রন প্রোটনের আক্রমণেই আয়নোস্ফিয়ারে মের‍ুজ্যোতির স‍ৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

মের‍ুজ্যোতির আলোর প‍ুঙ্খান‍ুপ‍ুঙ্খ পরীক্ষা করা হয়েছে স্পেকট্রোস্কোপ দিয়ে। মের‍ুজ্যোতিতে যে উজ্জ্বল একটা সব‍ুজ আলো খ‍ুব দেখা যায়, বর্ণালী পরীক্ষাতে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য পাওয়া গেছে 5577A°। এ কথা জানা গেছে, কেবলমাত্র অক্সিজেন পরমাণ‍ু থেকে এই তরঙ্গ উৎসারিত হ'তে পারে। এ থেকে প্রমাণিত হ'ল উপরের স্তরে অক্সিজেন আছে এবং সেটা পরমাণ‍ু হ'য়ে আছে। সেই অক্সিজেন পরমাণ‍ু উত্তেজিত হ'য়ে মের‍ুজ্যোতির আলোর খানিকটা উৎপাদন করছে। তেমনি নাইট্রোজেন পরমাণ‍ুর অস্তিত্ব এবং তার উত্তেজিত অবস্থার আলো-বিকিরণও মের‍ুজ্যোতির বর্ণালী অন‍ুশীলনে ধরা পড়েছে। যে সকল পটি-বর্ণালী ধরা পড়েছে সেগ‍ুলো প্রায়ই নাইট্রোজেনের অণ‍ু থেকে স‍ৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া, মের‍ুজ্যোতিতে হাইড্রোজেন-সঞ্জাত আলোরশ্মিও ধরা পড়েছে। সৌরকণাস্রোতে যে হাইড্রোজেন আয়ন থাকে তার ত' আলোবিচ্ছ‍ুরণ ক্ষমতা নেই। বায়‍ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পর ম‍ুক্ত ইলেকট্রনের সঙ্গে সংহত হ'য়ে হাইড্রোজেন পরমাণ‍ু স‍ৃষ্টি হয়। সেই হাইড্রোজেন পরমাণ‍ুগ‍ুলোও উত্তেজিত অবস্থায় মের‍ুজ্যোতির আলোতে অংশ নেয়। স‍ূর্য্য থেকে প্রবল বেগে হাইড্রোজেন আয়ন ছ‍ুটে আসে। বর্ণালী যন্ত্রের পরীক্ষায় মনে হয়, সেকেণ্ডে অন্ততঃ 3000/4000 কিলোমিটার গতিতে এসে এই কণাগ‍ুলো বায়‍ুস্তরের সীমানায় প্রবেশ করে, তাই এদের প্রচুর শক্তি থাকে।

সৌর কণার সবগ‍ুলোর গতি এক নয়। তাদের শক্তির পরিমাণও এক নয়। বায়‍ুর পরমাণ‍ুগ‍ুলো এদের সঙ্গে ধাক্কা খেলে সেগ‍ুলো বিভিন্ন পরিমাণে উত্তেজিত হয়, তাই ভিন্ন ভিন্ন আলোর তরঙ্গ ক্রমাগত উৎসারিত হ'তে থাকে।

মের‍ুজ্যোতিতে যে আলোর সদাচঞ্চল ন‍ৃত্য দেখা যায় আর আকৃতির পরিবর্তন ঘটে, এটাই তার কারণ। মের‍ুজ্যোতির বৈচিত্র্যের এটাই হেত‍ু। সৌরকণাগ‍ুলো যত বেশী দ্র‍ুতগতিশীল হবে, ততই বেশী তারা বায়‍ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে ঢ‍ুকবে এবং আরও বেশী পরমাণ‍ুকে উত্তেজিত করবে ও উজ্জ্বলতর আলোর স‍ৃষ্টি করবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠবে ঃ যদি সৌরকণা-প্রবাহের জন্যেই মের‍ুজ্যোতির উদ্ভব, তা হ'লে সেই কণাস্রোত ত' প‍ৃথিবীর উপরে সর্বত্রই আসছে। মের‍ুজ্যোতি শ‍ুধ‍ু মের‍ু অঞ্চলের আকাশে দেখা যায় কেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, প‍ৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব এর জন্য দায়ী। প্রোটন, ইলেকট্রন এগ‍ুলো ত' বিদ‍ুৎকণা। এরা যখন প্রবাহিত হয় তখন কার্যতঃ একটা তড়িৎপ্রবাহ ব'য়ে যায়। প‍ৃথিবীর চারদিকে ঘিরে রয়েছে একটা চৌম্বক ক্ষেত্র, কারণ প‍ৃথিবী নিজেই হচ্ছে একটা বিরাটাকার চুম্বক। এই চুম্বকের দ‍ুই প্রান্ত-মের‍ু ভৌগোলিক মের‍ুর কাছেই একটু কোণাকুণি হ'য়ে রয়েছে। উত্তর প্রান্ত রয়েছে 78·5°N এবং 69°W অর্থাৎ গ্রীনল্যাণ্ডে। তড়িৎ-প্রবাহের উপরে

চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব খুব প্রখর। পৃথিবীর কাছে যখন প্রোটন, ইলেকট্রন বা অন্যান্য আয়ন উপস্থিত হয় তখন এরা চুম্বকের আকর্ষণে চুম্বক-রেখার নির্দেশে বেঁকে যায় এবং উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্তের দিকে এসে জড় হয়। এই প্রান্তদেশেই চৌম্বক ক্ষেত্র খুব জোরালো এবং শক্তিশালী। সুতরাং দুই মেরু-অঞ্চলের বাতাসের কণা থেকেই মেরুজ্যোতি দেখা যায়।

বিজ্ঞানী বিকল্যাণ্ডের পরীক্ষায় এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি একটি চৌম্বকীয় গোলক তৈরী ক'রে তার উপরে ফসফরের প্রলেপ দিয়ে নেন। এটিকে একটি স্বল্প চাপের প্রকোষ্ঠে রেখে তাতে ইলেকট্রন-রশ্মি প্রেরণ করেন। দেখা গেল, গোলকের দুই প্রান্তে আলোর বিকিরণ হচ্ছে, মেরুজ্যোতির অনুরূপ।

চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির প্রভাব বিদ্যুৎকণাগুলোর গতিবিধির উপর খুব প্রবল। চুম্বক-শক্তির অতি সামান্য পরিবর্তন হ'লেই বিদ্যুৎকণাগুলোর গতির দিক এবং বেগ বদলে যায়। ওরা তখন ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করে, তাই অনবরত মেরুজ্যোতিতে আলোর উজ্জ্বলতার আর আকারের পরিবর্তন দেখা যায়।

চৌম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে মেরুজ্যোতির এবং আয়নোস্ফিয়ারের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আমরা যে কম্পাসের কাঁটা দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ দিক নির্ণয় করি, সেটা ত' পৃথিবীর চুম্বক-ক্ষেত্র আছে বলেই। অনেক সময় দেখা যায়, যে কম্পাস-কাঁটা তার নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে গেছে। কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিন ধরে এটা হ'তে পারে। এবং অনেক সময় সেটা কাঁপতে থাকে। তখন বোঝা যায়, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে আলোড়ন চলছে—একে বলে "চৌম্বক-ঝড়" (Magnetic storm)। সৌরকলঙ্কের বছরগুলিতে এ রকম চৌম্বক-ঝড় খুব বেশী হয়। সৌরকলঙ্ক থেকে অত্যধিক বিদ্যুৎকণা-প্রবাহ ছুটে আসে এবং পৃথিবীর চুম্বক-ক্ষেত্রকে বিপর্যস্ত করে তোলে, বিশেষ করে মেরু অঞ্চলে। চৌম্বক-ঝড়ের সময় মেরুজ্যোতি তাই খুব উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দেয়। চৌম্বক-ঝড়ের সময় আয়নোস্ফিয়ারের বিরাট সব পরিবর্তন হয়। F_2-স্তর ত' খুবই অস্থির হ'য়ে পড়ে। বেতার তরঙ্গের প্রতিফলন দুষ্কর হয়ে ওঠে। সমস্ত আয়নোস্ফিয়ারটাই এলোমেলো হ'য়ে যায়। রেডিও সংবাদ আদান-প্রদান বন্ধ হ'য়ে যায়।

অনেক সময় দেখা যায়, সাতাশ দিন পরপর তীব্র মেরুজ্যোতি এবং আয়নোস্ফিয়ারের চৌম্বক-ঝড়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে। মনে রাখতে হবে, সূর্য্যও 27 দিনে নিজের অক্ষের উপর একবার ঘুরে আসে। মনে কর, আজ সৌরদেহে কলঙ্ক দেখা দিল এবং সেজন্য আয়নোস্ফিয়ারে ঝড় দেখা দিল। সূর্য্য ঘুরপাক খাচ্ছে, তাই সৌরকলঙ্কগুলি এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সরে যেতে থাকবে। এইভাবে সৌরকলঙ্ক পৃথিবীর বিপরীত দিকে গিয়ে অদৃশ্য হ'লে সৌরকলঙ্কের প্রভাব কমে যাবে, আয়নোস্ফিরার সুস্থির হবে, মেরুজ্যোতি স্তিমিত হবে। সাতাশ দিন পরে সেই সৌরকলঙ্ক পৃথিবীর মুখোমুখী হবে (যদি তখনও তার অস্তিত্ব থাকে), তখন আবার মেরুজ্যোতির উজ্জ্বলতা বাড়বে। চৌম্বকঝড়েরও প্রাবল্য দেখা দেবে।

বেশী দিনের কথা নয়—এই কয়েক বছর হ'ল বিজ্ঞানীরা নানা যন্ত্রপাতি দিয়ে কৃত্রিম উপগ্রহ আর রকেট পাঠিয়েছিলেন বায়ুমণ্ডলের বহিঃস্তরে অর্থাৎ আয়নোস্ফিয়া-

রেরও অনেক উপরে। উদ্দেশ্য ছিল বহিঃস্তরের সীমানার মহাজাগতিক রশ্মির এবং বিদ্যুৎকণার তথ্য-সন্ধান। দেখা গেল, নিরক্ষরেখা অঞ্চলের উপরের আকাশের বহিঃস্তরে বিদ্যুৎকণার পরিমাণ বেশ বেড়ে যাচ্ছে। এটা আগে ভাবতেও পারা যায়নি, ধারণা ছিল অধিকাংশ বিদ্যুৎকণা গিয়ে জড় হবে মেরু অঞ্চলের উপরে চুম্বক-ক্ষেত্রের
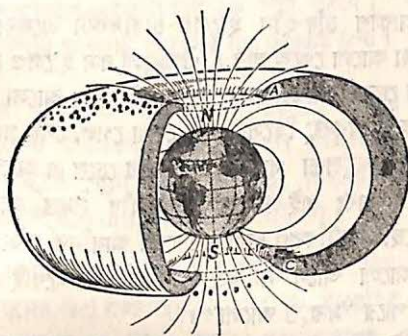
চিত্র ৪২। ভ্যান-এলেন স্তরের অবস্থান

প্রভাবে। কিন্তু সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া গেল, 2000~4000 কিলোমিটার উচ্চতায় অর্থাৎ আয়নোস্ফিয়ারের অনেক উপরে একটা পুরু স্তরে প্রচুর বিদ্যুৎকণার (ইলেকট্রন ও প্রোটনের) ঘনবসতি রয়েছে। নিরক্ষরেখা অঞ্চলের আকাশেই এটা ধরা পড়ল। এটা পেরিয়ে আরও উপরে গেলে প্রায় 15000 কিলোমিটার উচ্চতায় আর একটা এমনি ঘন বিদ্যুৎস্তর রয়েছে। এই স্তরগুলোর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন ভ্যান-এলেন আর তাঁর সহকর্মীরা, এই জন্য এই স্তর দু'টোকে বলা হয় "ভ্যান এলেন দীপ্ত স্তর" (Van Allen Radiation belt) অর্থাৎ, পৃথিবীর অনেকটা বাইরে দুটো বিদ্যুৎ-খোল রয়েছে, (চিত্র ৪২)। এখন বোঝা গেছে সৌরদেহ থেকে যে বিদ্যুৎ-কণা-প্রবাহ আসে, সেটার উপর পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্রের প্রভাব যথেষ্ট দূরে থাকতেই পড়ে। ফলে, সৌরকণাগুলো বিক্ষিপ্ত হ'য়ে সর্পিল পথ ধরে চলতে থাকে। এবং তড়িৎ-চুম্বকের বিধি অনুযায়ী সেই কণাগুলো দুই মেরুপ্রান্তের মধ্যে যাওয়া-আসা ক'রতে থাকে, সরাসরি আর ভূতলের দিকে এগোতে পারে না। সব সময়েই কিছুটা বিদ্যুৎকণা এই স্তর থেকে ছুট দেয় বা মুক্তি পায়। সেগুলো প্রবল আকর্ষণে মেরু প্রান্তের দিকে চলে যায়। আর তার সাহায্যেই মেরুজ্যোতির আবির্ভাব ঘটে।

এ ধারণাটা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে কোন রকমে যদি আমরা হঠাৎ বহিঃস্তরে যথেষ্ট বিদ্যুৎকণা ছেড়ে দিই, সেগুলো চুম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে ভ্যান-এলেন স্তরে যাবে এবং নতুন আরও মেরুজ্যোতি সৃষ্টি ক'রতে পারবে। এটা সত্যিই সম্ভব হ'ল। 1958 সালে 38° দক্ষিণ অক্ষাংশের বায়ুমণ্ডলের বহিঃস্তরে প্রায় 500 কিলোমিটার উপরে কয়েকটি পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ করা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ত' মেরুজ্যোতি দেখা গেলই, উপরন্তু এক মিনিটের মধ্যে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে উত্তর গোলার্ধে'ও পূর্ব গণনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট জায়গায় মেরুজ্যোতির আবির্ভাব

হ'ল। বোমা বিস্ফোরণে ইলেকট্রনগুলি বিদ্যুৎগতিতে ভ্যান-এলেন স্তরে গিয়ে পড়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে বিদ্যুৎকণা ঠিকরে বেরিয়ে কৃত্রিম মেরুজ্যোতি সৃষ্টি করেছিল। এই কৃত্রিম মেরুজ্যোতি শুধু বিজ্ঞানের অসামান্য সাফল্য নয়, এটা আমাদের তত্ত্বটিকে নির্ভুল প্রমাণ ক'রে দিল। এ ধরনের পরীক্ষা পরে আরও করা হয়েছে।

মারুত আলো (Airglow)

রাত্রির নির্ম্মল আকাশ চাঁদ-হীন হ'লেও চারদিকটা একেবারে নিকষ কালো হ'য়ে যায় না। একটা আবছা আলো থেকে যায়। ঔজ্জ্বল্য কম হ'লেও সেই স্তিমিত আলোতে পথ চলা যায়, বাড়ীঘর চেনা যায়। মনে হবে, এই ক্ষীণ আলো আসছে সুদূর নক্ষত্রলোক, নীহারিকা থেকে। কিন্তু হিসেব কষে দেখা গেল, সেই গ্রহ-তারা ইত্যাদি থেকে আসা আলোকের যতটা উজ্জ্বলতা থাকার কথা তার চেয়ে এ আলোর উজ্জ্বলতা অনেক বেশী, প্রায় দ্বিগুণ। এবং এই আলো পৃথিবীর সমস্ত জায়গাতেই পাওয়া যায়। এটাও বেশ বোঝা গেছে, সূর্য্যকিরণ দ্বারা বাতাসের আয়নিত হওয়া অথবা মেরুজ্যোতির অবশেষ থেকেও এই আলো আসে না, বস্তুতঃ বাতাসের মধ্যেই এই আলোর উৎপত্তি। তাই একে বলা যেতে পারে "মারুত আলো"।

গোধুলিতে বা ঊষাকালে যে আমরা একটা মনোরম আলো দেখি সেটা কিন্তু আলাদা। সেখানে সূর্য্য দিগন্তরেখার নীচে চলে গেলেও তার খানিকটা আলোরশ্মি এসে বায়ুর উপরের স্তরে পেঁছুতে পারে। সেই রশ্মি সূক্ষ্ম ধূলিকণা এবং বাতাসের অণুদ্বারা বিচ্ছুরিত হ'য়ে গোধূলির আলোর সৃষ্টি করে। সূর্য্য যখন নামতে নামতে দিগন্তরেখার 18° ডিগ্রী নীচে চলে যায়, তখন আর আলো আসতে পারে না, গোধূলির আলোর পরিসমাপ্তি হয় আর রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে। ঊষার আলোরও ঐ একই কারণ।

মারুত আলোর বর্ণালী পরীক্ষা ক'রে যে সব রেখা পাওয়া গেছে, তা থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, দিনের বেলায় সূর্য্যালোকের হ্রস্ব তরঙ্গগুলি থেকে খানিকটা নিয়ে অক্সিজেন অণুগুলি পরমাণুতে ভেঙে যায়। রাত্রিবেলায় এই বিচ্ছিন্ন অণুগুলি আবার পুনর্মিলিত হ'য়ে অণুতে পরিণত হয়। এই সময় সেই শক্তিটুকু ক্ষীণ আলোর আকারে
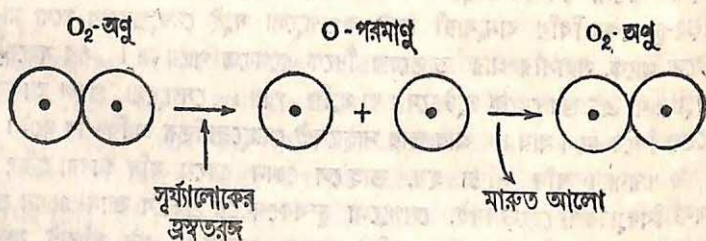
চিত্র ৪৩। মারুত আলো সৃষ্টির ব্যাখ্যা

বেরিয়ে এসে মারুত আলো সৃষ্টি করে। এ সব পরিবর্ত্তনের সময় সামান্য সোডিয়াম এবং ক্যালসিয়াম পরমাণুও উত্তেজিত অবস্থায় এসে যায় এবং আলো বিকিরণ করে।

বায়ু-দূষণ

বাতাস সম্পর্কে আর একটা কথা আছে। বর্তমানে বায়ু নিয়ে—বিশেষ ক'রে ট্রোপোস্ফিয়ারের বায়ু নিয়ে—একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। নানা কারণে বায়ু অত্যন্ত দূষিত হয়ে উঠছে। বায়ুর উপর আমাদের জীবন ও স্বাস্থ্য নির্ভর করছে, সুতরাং এই বায়ুদূষণ চলতে থাকলে অবস্থাটা মারাত্মক হয়ে উঠবে। বায়ুর দূষণ খানিকটা প্রকৃতিজাত, কিন্তু বেশীর ভাগটাই মানুষের কর্মকাণ্ডের জন্য।

বায়ুপ্রবাহ প্রচুর ধূলিকণা মাটি থেকে বাতাসে নিয়ে আসে ; সমুদ্র-জলের বাষ্পায়নের সঙ্গে যথেষ্ট লবণকণা এসে বাতাসে হাজির হয় ; উলকা থেকে প্রতি-মুহূর্তে প্রচুর ভস্ম বায়ুতে স্থান পায় ; তাছাড়া অসংখ্য জীবাণুও সতত বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। বায়ুদূষণে এগুলি প্রকৃতির অবদান।

এই শতকে, বিশেষতঃ গত তিন চার দশকে জনসংখ্যা বিপুলভাবে বেড়েছে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য কলকারখানা যানবাহন ইত্যাদির দ্রুত প্রসার হয়েছে। এই সকল থেকেই বায়ুদূষণ বেশী হয়। বায়ুদূষণের প্রধান উৎসগুলি হল : (১) যানবাহন, মোটরগাড়ী, রেল, এরোপ্লেন ইত্যাদি, (২) কলকারখানা, (৩) তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানীর দহন, (৪) গৃহের এবং কারখানার চুল্লী ও উনুন (৫) অনাবশ্যক জঞ্জাল ও আবর্জনা (garbage), শুকনো লতাপাতার দহন। শেষেরটি ছাড়া অন্যগুলিতে সচরাচর কয়লা অথবা জ্বালানী তেল (পেট্রোল, ডিজেল) পোড়ান হয়। সেইসব থেকে অবাঞ্ছিত ধোঁয়া সতত এসে বাতাসে মিশছে। চিমনীর ধোঁয়া এবং বাড়ীর চুল্লীর ধোঁয়া থেকে অবিশ্বাস্য পরিমাণ ধূলিকণা, বিশেষতঃ কয়লার গুঁড়ো, বাতাসে আশ্রয় নিচ্ছে। ধূলোকণা ছাড়াও নানা বিষাক্ত গ্যাস আসছে এবং কিছু কিছু তরল পদার্থ সূক্ষ্ম বিন্দু হ'য়ে বাতাসে ভাসছে। কয়লার চুল্লী বা চিমনী থেকে উৎপন্ন ধোঁয়াতে সর্বদাই কিছু সালফার-ডাইঅক্সাইড থাকে, সেটা পরে সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হ'য়ে পড়ে। এর সঙ্গে কিছু অতি সান্দ্র আলকাতরা-জাতীয় তরল পদার্থও থাকে। ঘরের পাখা বা জানালার পর্দার দিকে তাকালেই এর অস্তিত্ব জানা যাবে। যানবাহনের জ্বালানী তেল থেকে নির্গত গ্যাসে হাইড্রোকার্বন-জাতীয় জৈব পদার্থ ত' থাকেই, তার সঙ্গে নাইট্রোজেন অক্সাইডও থাকে। এগুলো বিশেষ অপকারী।

গ্রামাঞ্চলে যেখানে কলকারখানা নেই এবং যান্ত্রিক যানবাহনের চলাচল কম সেখানে বায়ু বিশেষ দূষিত হয় না। বায়ুদূষণ বেশী হয় বড় বড় সহরে আর শিল্পনগর-গুলিতে। আমাদের দেশে বায়ুদূষণের পরিমাণ সম্পর্কে তেমন কোন পরীক্ষা হয় নি, সবেমাত্র সুরু হয়েছে। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাতে অনেকদিন থেকেই এসব সন্ধান করা হ'চ্ছে। মোটরগাড়ী, বাস ইত্যাদি থেকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বছরে প্রায় দশ কোটি টন দূষক বাতাসে প্রবেশ করে আর ফ্যাক্টরীগুলি থেকে প্রায় তিন কোটি টন। চুল্লী আর উনুন থেকে বছরে সেখানে দূষিত পদার্থ বাতাসে আসে 1.1 কোটি

টন এবং তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি থেকে প্রায় দুই কোটি টন। পাশের ছবি (চিত্র ৪৪) থেকে এর একটা ধারণা হবে। বিভিন্ন দেশে এবং সহরে অবশ্য এই অনুপাতের তারতম্য হবে।

যানবাহন (61%)
কলকারখানা (17%)
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (12%)
চুল্লী (7%)
জঞ্জালদহন (3%)

চিত্র ৪৪

বায়ুদূষণ থেকে নানারকম ক্ষতি সাধিত হয়, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্যের উপর দূষিত বায়ুর প্রতিক্রিয়া। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সূক্ষ্ম কণাগুলো, যাদের ব্যাস মোটামুটি 10^{-5} সেমি, ফুসফুসে গিয়ে প্রবেশ করে এবং অনেক সময় সেখানেই থেকে যায়। এর ফলে খুবই শ্বাসকষ্ট হয়। গলায়, নাকে, শ্বাসনালীতে প্রদাহের সৃষ্টি হয়। সিলিকোসিস খুব সহজে হয়। যক্ষ্মা, নিউমোনিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ঐসব কণার সঙ্গে অনেক জীবাণু কিংবা সান্দ্র তরলও প্রবেশ করে। রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে নানারোগের সৃষ্টি করে। মানুষের হাঁচি-কাশি থেকে বাতাসে যে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে সেটা প্রশ্বাসের সঙ্গে অপরের দেহে গিয়ে সেই সব রোগের উৎপত্তি ঘটায়। অনেক সংক্রামক ব্যাধি এইভাবে দূষিত বায়ুর মাধ্যমেই বিস্তারিত হয়। ইংল্যাণ্ডের একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে, কলকারখানা বা অফিসের অনুপস্থিতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই সকল জীবাণুর আক্রমণের ফলে। শুধু মানুষ নয়, দূষিত বায়ুর গ্যাস গ্রহণের ফলে অনেক জীবজন্তুরও ক্ষতি হয়। বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে থাকলে শাকসব্জীর উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই কারণেই বড় বড় ফ্যাকটরীর আশেপাশে বিশেষ শাকসবজী বা ছোট গাছপালা দেখা যায় না। বড় বড় প্রধান সরণীতে প্রচুর যানবাহন চলে বলে তার দুপাশেও ফলন খুব সামান্য। অর্থাৎ বায়ুদূষণের ফলে কৃষি এবং শস্যের চাষবাসের ক্ষতি হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এই কারণে ক্ষতি হয় বছরে পঞ্চাশ কোটি ডলার। আবার দূষিত সবজীর জন্য গরু ছাগল এরাও রোগাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে। পারিবেশিক আবহাওয়া দূষণের ফলে কী ভীষণ ক্ষতি হতে পারে তার একটি বাস্তব উদাহরণ এক সাময়িক পত্রিকা (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জুন, 1982) থেকে উদ্ধৃত করছি।

"ধানবাদ থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে টুণ্ডুতে লেড-স্মেল্টারের কারখানায় সীসা ও রূপা তৈরী হয়। এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ সীসার বাষ্প, সালফার ডাইঅক্সাইড ও ধূলো নির্গত হয়। তা'তে কর্মরত শ্রমিকদের উপর যে অস্বাস্থ্যকর প্রভাব পড়ে, তার চেয়েও বেশী ক্ষতি হয় চারপাশের গ্রামের। কারখানা থেকে নির্গত ধোয়ানী অতি মাত্রায় অম্ল এবং সেই জলে সীসা ও সালফেটের মাত্রা খুব বেশী। সেটা যথাযথ পরিশোধনের ব্যবস্থা না থাকায় পাশাপাশি অঞ্চলের মানুষ, পশুপাখী ও গাছপালার উপর গুরুতর প্রভাব ফেলছে। বাতাসে ভেসে যাওয়া সীসা বাষ্প ও সালফার ডাইঅক্সাইড নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে গিয়ে দীর্ঘস্থায়ী জটিল বুকের রোগ তৈরী করছে মানুষ এবং পশুর। সেই সঙ্গে গাছের পাতা হয় বিবর্ণ, উদ্ভিদের

ফলের বৃদ্ধি রোধ ঘটে। জীবজন্তুসহ কৃষি হয় বিপন্ন। এই সব ভারী ধাতুকণা ও তাদের রাসায়নিক যৌগের মিশ্রণে দূষিত বাতাস, জল ও মাটি দিয়ে মানুষ ও পশু-পাখী প্রত্যক্ষভাবে জটিল রোগে আক্রান্ত হয় ; বিশেষ করে স্নায়ুরোগ ও রক্তদূষণ। একইভাবে ঐ সীসা তৈরী কারখানার আশেপাশে গাছপালা, ঘাস ও সবজীর উপর সীসা জমতে থাকে। গবাদি পশুরা ঐ ঘাস খাওয়াতে তাদের দুধে সীসার মাত্রা পরিবেশের মাত্রার চেয়ে অনেক বেশী। ………কৃষিরও স্থায়ী অনিষ্ট ঘটে।"

বায়ুদূষণের জন্য দেশের আর্থিক ক্ষতিও হয় প্রচুর। আর্দ্র দূষিত বায়ুর সালফার-ডাইঅক্সাইড এবং আলকাতরা-জাতীয় ক্ষয়কারী পদার্থগুলি লৌহ ও অন্যান্য ধাতু, কংক্রীট, কাঠ রবার, নাইলন প্রভৃতিকে সহজেই আক্রমণ করে ও ক্ষয় করে, যেমন রেলিং, জানালার শিক ইত্যাদি। গ্রামাঞ্চলের অবাহাওয়ার তুলনায় শিল্পাঞ্চলে অন্ততঃ ত্রিশগুণ দ্রুত ক্ষয় পায়। বাড়ীঘর, জামাকাপড় ইত্যাদি নোংরা হওয়ার ফলে সেগুলোকে ঘনঘন পরিষ্কার করার জন্য কেবল অতিরিক্ত সময়ের ব্যয় হয় তাই নয়, সেজন্য সোডা সাবানের খরচও অনেক বৃদ্ধি পায়।

ধোঁয়াশা ঃ সাধারণতঃ ধোঁয়া আর কুয়াশার সংমিশ্রণেই ধোঁয়াশার সৃষ্টি। ঘন ধোঁয়ার প্রচুর সূক্ষ্ম কঠিন কণাগুলোর উপর জলবিন্দু এবং অন্যান্য সান্দ্র তরল জমে গাঢ় ভারী অস্বচ্ছ বায়বীয় পরিবেশ তৈরী করে, সেটাই ধোঁয়াশা। একটা গভীর আচ্ছাদনের মত ঢেকে থাকে। বড় বড় সহরে ও শিল্প নগরীতে, যেখানে প্রচুর ধোঁয়া আছে, সেখানেই ধোঁয়াশা বেশী হয়। এর মধ্যে অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাসও থাকে। মাটির উপরের অপেক্ষাকৃত শীতল ধোঁয়াযুক্ত বায়ুর উপর যদি একটি উষ্ণতর বায়ুস্তর এসে স্থিতিশীল হয় তবে সহজেই ধোঁয়াশা গড়ে ওঠে এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। অপ্রতুল বায়ুচলাচলের জন্য এই ধোঁয়াশার অবস্থা অনেক সময় ধ'রে থাকে, এমন কি তিন চার দিন থাকতে পারে। কয়লার চুল্লী বা ফ্যাক্টরী থেকে নির্গত ধোঁয়া থেকে উৎপন্ন ধোঁয়াশাতে যথেষ্ট সালফার ডাইঅক্সাইড থাকে। এজন্য শ্বাসপ্রশ্বাসে খুব কষ্ট হয় এবং ফুসফুসের ও শ্বাসনালীর প্রদাহ হয়। বিষাক্ত গ্যাসের জন্য মৃত্যুসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। নানাস্থানে অনেক ধোঁয়াশা-জনিত দুর্ঘটনা ঘটেছে ; কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ—

স্থান	তারিখ	প্রতিক্রিয়া
১। নিউইয়র্ক	24-30 নভেম্বর 1966	মৃত্যু ঃ 168
২। লণ্ডন	5-9 ডিসেম্বর 1952	মৃত্যু ঃ 4000
৩। ডোনোরা (ফিলাডেলফিয়া)	6-31 অক্টোবর 1948	মৃত্যু ঃ 20, অসুস্থতা 6000

একটি বিশেষ ধরণের ধোঁয়াশা, যেটা যানবাহনের অতিরিক্ত ধোঁয়া থেকে কুয়াশার সংযোগে তৈরী হয় সেটাকে বলা হয় আলোক রাসায়নিক ধোঁয়াশা বা Photo-chemical smog। জ্বালানি তেল, ডিজেল, পেট্রোল প্রভৃতি পোড়ানোর ফলে মোটরগাড়ী ও অন্যান্য যানবাহন থেকে নির্গত গ্যাসে হাইড্রোকার্বন জাতীয়-পদার্থ

থাকে এবং সেই সঙ্গে তাপের জন্য উদ্ভূত বেশ খানিকটা নাইট্রোজেন অক্সাইডও (NO, NO_2) থাকে। সূর্য্যালোকে এই সব পদার্থগুলির আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং হাইড্রোকার্বন-জাতীয় জৈব পদার্থগুলি জারিত হয় ; কিছু ঝাঁঝালো এবং বিষাক্ত পদার্থের সৃষ্টি করে। এই পদার্থের মধ্যে থাকে বিশেষ ক্ষতিকর পার-অক্সি-অ্যাসিটাইল নাইট্রেট, সংক্ষেপে PAN। যানবাহনের ধোঁয়া থেকে উৎপন্ন ধোঁয়াশাতে যথেষ্ট PAN থাকায় তা দুঃসহ। লস এঞ্জেলস সহরে এ রকম ধোঁয়াশা বেশী দেখা যায়। আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের বড় বড় সহরেও এরূপ ধোঁয়াশার প্রাদুর্ভাব রয়েছে।

ধোঁয়াশার সালফার-ডাইঅক্সাইড বাতাসের আর্দ্র বস্তুকণার সঙ্গে মিশে কলয়ডীয় এয়ারোসল তৈরী করে। এটি শ্বাসযন্ত্রে প্রবেশ ক'রে বিপত্তি ঘটায়। সামান্য পরিমাণ (100 Mg/m^3) গ্রহণ করলে বিশেষতঃ বয়স্ক ব্যক্তিরা গুরুতর ব্রঙ্কাইটিস রোগে আক্রান্ত হন। এমন কি তরুণ ও শিশুদেরও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। হাঁপানির রোগীদের মৃত্যুও হ'য়ে থাকে।

ধোঁয়াশাতে নাইট্রোজেন-ডাইঅক্সাইড থাকে। এই গ্যাস (NO_2) 0.5 নিযুতাংশ (ppm) বায়ুতে থাকলে উদ্ভিদ ও ফলাদির বৃদ্ধি রোধ করে। আরও বেশী পরিমাণ থাকলে (>100 ppm) শ্বাসনালী আক্রান্ত হয় এবং নিউমোনিয়া হয়।

যানবাহনের মোটরের ভিতরের ঘর্ষণকালে কিছু ওজোন তৈরী হয় এবং সেটা ধোঁয়াশাতে থাকে। 1 ppm মাত্রার ওজোন অল্প সময়ের মধ্যেই উদ্ভিদের প্রচুর ক্ষতি করে। বিশেষ ক'রে মটরশুঁটি জাতীয় গাছের পাতা, তামাকপাতা প্রভৃতিকে একেবারে বিবর্ণ ও নষ্ট ক'রে দেয়। এটা শ্বাসকষ্টেরও একটা কারণ।

আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশাতে রয়েছে ঝাঁঝালো অ্যাক্রোলিন, PAN ইত্যাদি। এগুলো থেকে খুব চোখের যন্ত্রণা হয়। তাছাড়া সামান্য পরিমাণ PAN সবুজ উদ্ভিদের মারাত্মক ক্ষতি করে।

ধোঁয়াশার জন্য সূর্য্যালোকের অধিকাংশই এসে মাটিতে পোঁছয় না। পাতার সালোকসংশ্লেষ ব্যাহত হয় ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয় না। আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্য উভয়ের উপরেই সূর্য্যালোকের বিশেষ প্রভাব আছে। সূর্য্যালোকের অভাবে কর্মক্ষমতা অনেকটা হ্রাস পায়। দীর্ঘ সময় স্তিমিত আলোতে অথবা অন্ধকারে কাজ করলে বিষণ্ণতা এসে পড়ে। পরোক্ষে এসব উৎপাদনের ক্ষতি করে। ধোঁয়াশার জন্য যানবাহন চলাচল সীমিত থাকে। এরোপ্লেনের যাতায়াত বন্ধ রাখতে হয়। এর জন্যও কোটি কোটি টাকার ক্ষতি অনিবার্য্য। আশার কথা, সমস্ত জাতিই এই মানুষের তৈরী উৎপাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য এখন সচেষ্ট। উন্নত ধরণের ইঞ্জিনের ব্যবস্থা, চিমনীর গ্যাসের পরিষ্করণের ব্যবস্থা ইত্যাদি বাধ্যতামূলক করার জন্য অনেক দেশেই আইন তৈরী হচ্ছে।

* * * *

পৃথিবী বাতাসের কম্বলটা মুড়ি দিয়ে আছে। তাই আমাদের অস্তিত্ব। শুধু যে অক্সিজেন দিয়ে আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, তথা প্রাণ ধারণে বাতাস সাহায্য করছে তাই নয়, সমস্ত জীবজগতের খাদ্যের প্রধান যোগানদারও বাতাস। বাতাসের

কার্বন-ডাইঅক্সাইডের উপর নির্ভর ক'রে উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব আর বৃদ্ধি। আর সেই উদ্ভিদই মেটাচ্ছে সমস্ত প্রাণীজগতের খাদ্যের প্রয়োজন।

শুধু তাই নয়, যদি এই বাতাসের মোড়কটা হঠাৎ কোন কারণে উঠে যায় বা লোপ পায় তাহ'লে দিনের বেলা সূর্য্যের সমস্ত রশ্মি সরাসরি পৃথিবীর উপরে পড়বে আর খানিকক্ষণের মধ্যে সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সমুদ্র শুকিয়ে গিয়ে শুষ্ক মরুতে পরিণত হবে। জীবজগতের অস্তিত্ব লোপ পাবে। আর রাত্রিতে হ'লে সব কিছু জমে এত হিমশীতল হবে যে প্রাণের কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

বাতাস আছে, তাই উল্কার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছি। বাতাস না থাকলে লক্ষ লক্ষ উল্কাপিণ্ড এসে সারা পৃথিবীকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলত আর আগুন ধরিয়ে দিত।

শব্দ যে কম্পন সৃষ্টি করে সেটা বাতাসের মাধ্যমে চারিদিকে পরিচালিত হয়। সেই কম্পন এসে যখন কানের পর্দায় আঘাত করে তখন মস্তিষ্ক সেটা জানতে পারে। বিভিন্ন তরঙ্গের কম্পন থেকে মস্তিষ্ক বিভিন্ন শব্দের পার্থক্য ধরতে সক্ষম। বাতাসই আমাদের শব্দের পরিবহণকারী। বাতাস আছে তাই যেমন মেঘগর্জন শুনতে পাই, শুনতে পাই পাখীর কূজন, তেমনি আবার শুনতে পাই লতা মুঙ্গেশকরের সুরলহরী। বাতাস যদি শব্দ বহন না ক'রত, তাহ'লে কি হ'ত? উচ্চারণও হ'ত না, কথাও বলা যেত না।

বাতাস আছে, তাই বসুন্ধরা এত শস্যশ্যামলা, ধরিত্রীর এত রূপ। বাতাস আছে, তাই মেঘকে ধরে রাখছে, বাতাসের জন্যই ত মাথার উপরের আকাশ এত বৈচিত্র্যময়।

সুদূর অতীতে মানুষের প্রত্যয় ছিল যে পঞ্চভূত দিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সৃষ্টি, বাতাস তারই একটি, সে ধারণা থেকে অনেকদূরে আমরা সরে এসেছি। স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা মানুষকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তার ফলে মানুষ বাতাসের রাজ্যের যেসব কথা জেনেছে, যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তারই সংক্ষিপ্ত সংবাদ রয়েছে এই পৃষ্ঠাগুলিতে। কিন্তু এখনও জানার অনেক বাকী। আয়নোস্ফিয়ার সম্পর্কে অতি সামান্যই এ পর্য্যন্ত জেনেছি আমরা। উপরের স্তরের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় এখনও আমাদের গোচরে আসে নি। একথা সত্য, বায়ুর অনেক কিছুই আমরা নিজেদের প্রয়োজনে সার্থক প্রয়োগ করেছি। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের সংঘটন-প্রক্রিয়াগুলিকে এখনও আমরা আয়ত্তে আনতে পারিনি। কিন্তু যে মানুষ আজ পরমাণুর কেন্দ্র থেকে শক্তি আহরণ করছে, যে আজ অনায়াসে চাঁদের বুকে পদচারণ করছে, সেই মানুষ যে প্রক্রিয়াগুলিকে নিজের আয়ত্তে আনতে পারবে, সেটা সুনিশ্চিত। সেদিন মানুষ নিজের ইচ্ছামত বৃষ্টি নামাবে, মেঘের বিদ্যুৎভার টেনে নিয়ে এসে নিজের প্রয়োজনে লাগাবে, বায়ুপ্রবাহের গতিশক্তিকে সংগ্রহ ক'রে মেসিন চালাবে, ঝড়ঝঞ্ঝাকে সংরোধ করে তার প্রলয় তাণ্ডব থেকে নিজেকে রক্ষা করবে—সেই সম্ভাবনা রয়েছে।